বিজ্ঞান (www.bigyan.org.in) – এর
কিছু বাছাই লেখার সংকলন

বিজ্ঞান পত্রিকা

পঞ্চম সংখ্যা | সেপ্টেম্বর ২০১৬

পদার্থবিদ্যার কিছু বিস্ময়

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের দেখা মিললো

এলেবেলে বালি, বহমান বালি

কিছু ইতিহাস

মার্ভিন মিনস্কি

বিজ্ঞান পত্রিকা

যারা বিজ্ঞান ভালবাসে, বা
ভয় পায় তাদের জন্য

যারা ভালোবাসে,
বা ভয় পায়
তাদের জন্য ...

বিজ্ঞান পত্রিকা

পঞ্চম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০১৬

www.bigyan.org.in-এর বাছাই করা লেখার সংকলন

‘বিজ্ঞান’ সম্বন্ধে জানতেঃ

ওয়েবসাইট - www.bigyan.org.in
ফেসবুকের পাতা - https://www.facebook.com/bigyan.org.in

ইমেইল - bigyan.org.in@gmail.com

সূচীপত্র

মার্ভিন মিনস্কি

সায়মিন্দু দাশগুপ্ত ০৭

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর জনক, মার্ভিন মিনস্কি, কিছুদিন আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সায়মিন্দু দাশগুপ্ত।

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের দেখা মিললো

শাওন ঘোষ ও রাজীবুল ইসলাম ১১

কিছুদিন আগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লাইগো (LIGO) ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা জানালেন যে তাঁদের যন্ত্রে ধরা পড়েছে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। ১৩০ কোটি বছর আগে দুটি বিশালাকায় ব্ল্যাকহোল একে অপরের চারিদিকে প্রবল গতিতে ঘুরতে ঘুরতে ছাড়ছিল সেই তরঙ্গ। এত বছর পর পৃথিবীতে বসে আমরা দেখলাম সেই তাণ্ডবের ছবি। এই রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের কাহিনী পরিবেশন করেছেন শাওন ঘোষ ও রাজীবুল ইসলাম।

এলেবেলে বালি, বহমান বালি

সুমন্ত্র সরকার ৩১

বালি আপাতদৃষ্টিতে গবেষণার বিষয় হিসেবে তুচ্ছ লাগলেও বিজ্ঞানীদের ঘোল খাইয়েছে বহু বছর ধরে। না সে লোহার মত কঠিন, না জলের মত অবলীলায় বয়ে চলে। তার অদ্ভুত হোঁচট-খেয়ে-চলা প্রবাহকে বুঝতে গিয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছেন বিজ্ঞানীরা। কিছু রহস্যের কিনারাও হয়েছে। সেই কাহিনীই বলছেন সুমন্ত্র সরকার।

সম্পাদকীয়

প্রকাশিত হল 'বিজ্ঞান পত্রিকা'-র পঞ্চম সংখ্যা। সেই সাথেই এই পত্রিকা পার করে এল একটি বছর। 'বিজ্ঞান' ওয়েবসাইটে (www.bigyan.org.in) প্রকাশিত লেখাগুলির মধ্যে থেকে বাছাই করা কিছু লেখার সংকলন এই পত্রিকা। অনলাইনে প্রকাশ হয় প্রিন্ট-রেডি PDF ফরম্যাটে।

'বিজ্ঞান পত্রিকা'-র সাফল্য আমাদের নতুন করে উৎসাহ জুগিয়েছে। গত একবছরে প্রকাশিত এই পত্রিকার চারটি সংখ্যা মোট ছয় হাজারের বেশি বার ডাউনলোড হয়েছে। এই পত্রিকার হাত ধরে আমরা অনেক পাঠকের কাছে পৌঁছতে পেরেছি। যখন জানতে পারি যে মফঃস্বল ও গ্রামের বিভিন্ন স্কুলে - যেমন এগরা, হলদিয়া, পাহাড়হাটি, খানসাহেবের আবাদ-এর মত জায়গায় - ছাত্রছাত্রীদের কাছে 'বিজ্ঞান পত্রিকা'র লেখা পৌঁছচ্ছে স্কুলের মাধ্যমে, তখন মনে হয় আমাদের পরিশ্রম কিছুটা হলেও সার্থক হয়েছে। 'বিজ্ঞান' ওয়েবসাইট আর 'বিজ্ঞান পত্রিকা'-র হাত ধরে এমনভাবেই আধুনিক বিজ্ঞানের জগৎ বাঙালীদের কাছে মাতৃভাষায় ধরা দিক।

'বিজ্ঞান পত্রিকা'-র পঞ্চম সংখ্যাটি প্রকাশিত হচ্ছে ভারতের শিক্ষক দিবসে, অর্থাৎ ৫-ই সেপ্টেম্বরে। এর কয়েকটি তাৎপর্য আছে। আড়াই বছর আগে যখন 'বিজ্ঞান'-এর পথচলা শুরু হয়েছিল, তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে উন্নতমানের বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা পৌঁছে দেওয়া। ধীরে ধীরে আমরা জানতে পারি, যে আমাদের পাঠকদের মধ্যে একটা বড় অংশ হলেন বিভিন্ন স্কুলের মাষ্টারমশাই। এতে আমাদের উৎসাহ অনেকগুণে বেড়ে গিয়েছে - কারণ মাষ্টারমশাইরা উৎসাহিত হলে তাঁদের মাধ্যমেই লেখাগুলি পৌঁছে যেতে পারে অনেক ছাত্রছাত্রীর কাছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা আপনাদের অঞ্চলের স্কুলগুলোতে 'বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত লেখাগুলো আরও বেশি করে পৌঁছে দিন। সেই সাথে প্রশ্ন পাঠান আমাদের 'পাঠকের দরবার' বিভাগের জন্য (ইমেইল ঠিকানা - bigyan.org.in@gmail.com)। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোন বিজ্ঞান সেমিনারের আয়োজন করলে তার সম্বন্ধেও আমাদের জানান।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে বেশিরভাগ স্কুল মাষ্টারমশাইরা আধুনিক গবেষণার জগতের সাথে বিশেষ যোগাযোগ রাখার সুযোগ পান না। বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি চেষ্টা করে যাতে তাদের গবেষণার খবর সমাজের সবার কাছে, বিশেষত স্কুলপড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে যায়। তাই তারা নিয়ম করে বিভিন্ন স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষিকা-শিক্ষকদের নিমন্ত্রণ করে থাকে গবেষণাগার পরিদর্শনের জন্য। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই বছরের অন্তত একটি দিন বরাদ্দ থাকে public outreach বা জনসংযোগের জন্য। কিছু প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু দিন ধরে স্কুল শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য ওয়ার্কশপ চলতে থাকে, যার দায়িত্বে থাকেন বিশ্বসেরা কোন বিজ্ঞানী। উদাহরণ স্বরূপ, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (MIT)-র Teaching Opportunities in Physical Science বা TOPS ওয়ার্কশপ-এর উল্লেখ করা যেতে পারে।
শুধু তাই নয়, এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নিয়ম করে জানানো হয় বিভিন্ন আবিষ্কারের খবর - সহজ সরল ভাষায় যাতে সাধারণ পাঠক বুঝতে পারে যে তাদেরই দেওয়া করের টাকা গবেষকরা কীভাবে খরচ

করছেন। অবশ্যই এখানে কেউই আশা করবেন না, যে একদল বিজ্ঞানী গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে যা আবিষ্কার করেছেন তার সব একজন স্কুলশিক্ষক বা পড়ুয়া একদিনের পরিদর্শনে বুঝে যাবে। কিন্তু, এই ধরণের জনসংযোগ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়াদের উৎসাহ অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। আমাদের দেশেও কিছু গবেষণাগার এমন জনসংযোগের কাজ করে থাকে, যেমন মুম্বইয়ের হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশান (HBCSE) শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা এবং ওয়ার্কশপ করে। যে কোন শিক্ষক তাদের কাছ থেকে ট্রেনিং নিতে পারেন। যাদবপুরের Indian Association for the Cultivation of Science (IACS) বহু বছর ধরে ‘সামার স্কুল’-এর আয়োজন করে আসছে সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান পড়তে উৎসাহিত করার জন্য। কিন্তু এই ধরণের উদ্যোগ সংখ্যায় কম, আর অনেক ক্ষেত্রেই এর সুফল বড় শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে। আমাদের দেশের গবেষণাগারে কী নতুন গবেষণা হল তা সহজ করে আঞ্চলিক ভাষায় লেখা ও প্রচার করার প্রয়াসও হাতেগোনা।

আমরা আশা করব, 'বিজ্ঞান' এই অভাব আংশিকভাবে পূরণ করতে পারবে। আমাদের বেশিরভাগ লেখাই সদ্য আবিষ্কৃত বিষয়ের উপর, এবং বেশিরভাগ লেখকেরই সেই বিষয়ের গবেষণার সাথে প্রত্যক্ষ যোগ আছে। 'বিজ্ঞান'-এর প্রতিটা লেখা peer review পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যায়, সেখানে অন্তত তিনজন সম্পাদক ও বিশেষজ্ঞ লেখার বৈজ্ঞানিক ও ভাষাগত গুণমান যাচাই করেন। এমনকি, লেখক তালিকায় সম্পাদকমন্ডলীর এক বা একাধিক সদস্য থাকলেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

শিক্ষক দিবসে এই সংখ্যা প্রকাশের আর এক তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে এই সংখ্যার লেখাগুলির মধ্যে। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আবিষ্কারের উপর একটি প্রবন্ধ এই সংখ্যার মূল আকর্ষণ। কিন্তু, এর সাথে শিক্ষক দিবসের যোগ কোথায়? মহাকর্ষীয় তরঙ্গ, যা আইনস্টাইন একশো বছর আগে অঙ্ক কষে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, খোঁজার চেষ্টা করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা গত পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে। অবশেষে বহু বিজ্ঞানীর সহযোগিতায় তৈরি 'লাইগো' যন্ত্রে ধরা পড়ে একশ তিরিশ কোটি বছর আগে মহাকাশের সুদূর প্রান্তে দুটি ব্ল্যাকহোলের ধাক্কায় তৈরি হওয়া কম্পন! এই যন্ত্রটির ধারণা দেন MIT-র বিজ্ঞানী রাইনার ওয়াইস। ১৯৬৭ সালে তাঁকে পদার্থবিদ্যা বিভাগ থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয় আইনস্টাইনের সাধারণ অপেক্ষবাদ (general relativity) পড়ানোর জন্য। কিন্তু, তিনি তো এই বিষয়ের গবেষকই নন! চ্যালেঞ্জটা লুফে নিলেন। ভাবতে থাকলেন, কী পরীক্ষা করলে সাধারণ অপেক্ষবাদের অন্যতম ভবিষ্যদ্বাণী এই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ মাপা যেতে পারে? একটি পরীক্ষার নকশা করে ছাত্রছাত্রীদের হোম ওয়ার্ক প্রবলেমে ঢুকিয়ে দিলেন। সেই নকশাই পরবর্তীকালে জন্ম দিল 'লাইগো'-র। বিজ্ঞানের এত বড় একটা মাইলফলকের আদিতে ছিল এক শিক্ষকের জেদ আর একটা হোম ওয়ার্ক!

আরেকটা লেখা হল আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্সের জনক বলে পরিচিত সদ্য প্রয়াত মার্ভিন মিন্সকি-কে নিয়ে। ইনি একজন বহুল প্রতিভাধর মানুষ - তৈরি করেছেন কনফোকাল মাইক্রোস্কোপ যা জীববিদ্যার জগতে বিপ্লব এনে দিয়েছে। মার্ভিন গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা করেছেন আমরা কীভাবে শিখি সেই পদ্ধতি নিয়ে। তাঁর সাহচর্যে MIT Media laboratory-তে গবেষণা করেছেন অনেক ছাত্রছাত্রী যারা আজ কম্প্যুটার সায়েন্স ও আর্টিফিসিয়াল

ইনটেলিজেন্সের জগতের সেরা গবেষক। ঐ ল্যাবরেটরিরই এক বর্তমান গবেষক মার্ভিন মিনস্কিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন 'বিজ্ঞান'-এর পাতায়।

এই সংখ্যার অন্য লেখাটি একটা অতি সাধারণ বস্তু নিয়ে - বালি! বিজ্ঞানীদের বহুদিন ধরেই ধন্ধে ফেলেছে এই আপাত সহজ বস্তুটি। এমনকী বালি কঠিন না তরল, সে নিয়েও ঝামেলা! এই লেখার শেষে আমরা রাখছি একটা প্রোজেক্টের সম্ভাবনা। বালি নিয়ে এই প্রোজেক্টটি বিভিন্ন স্তরের ছাত্রছাত্রী দিয়ে করানো যায় - স্কুল থেকে কলেজে। আশা করি, স্কুল বা কলেজের কোন শিক্ষক তাদের স্কুল বা কলেজের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর জন্য এই প্রোজেক্টটি করাবেন। সফল হলে 'বিজ্ঞান'-এর ইমেইলে (bigyan.org.in@gmail.com) জানাতে ভুলবেন না!

'বিজ্ঞান'-এর সম্পাদকমণ্ডলী এই শিক্ষক দিবসে বিশ্বের সকল শিক্ষককে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

সম্পাদকমন্ডলী, ‘বিজ্ঞান’
৫-ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬

‘বিজ্ঞান’-এর সম্পাদনায় যারা আছি

- কুণাল চক্রবর্ত্তী (ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ব্যাঙ্গালোর)
- কাজী রাজীবুল ইসলাম (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, কেমব্রিজ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- দিব্যজোতি ঘোষ (অ্যাডোবি, সান হোসে, ক্যালিফোর্ণিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় (ম্যাথওয়ার্কস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অর্ণব রুদ্র (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং NGO পদক্ষেপ-এর সদস্য)
- অর্ণব রুদ্র (ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডেভিস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং NGO পদক্ষেপ-এর সদস্য)
- শাওন চক্রবর্ত্তী (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- কাজী ফারহা ইয়াসমিন (আই বি এম, কলকাতা)
- আবির দাস (ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, লোয়েল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সুমন্ত্র সরকার (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, ম্যাসাচুসেটস)
- সূর্যকান্ত শাসমল (কগনিজেন্ট টেকনোলজি সল্যুশনস, কলকাতা)
- চিরঞ্জীব মুখার্জী (হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ)
- দীপ্যমান প্রামাণিক (হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ)
- ঝুমা সন্নিগ্রাহী (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট, ড্রেসডেন, জার্মানী)
- অমলেশ রায় (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর কোল রিসার্চ, জার্মানী)
- ধ্রুবজ্যোতি সিনহা (আই. এম. আর. বি. ইন্টারন্যাশনাল, ক্যান্টার গ্রুপ)
- শ্রীনন্দা ঘোষ (টেকনিকাল ইউনিভার্সিটি ড্রেসডেন, জার্মানী এবং NGO পদক্ষেপ-এর সদস্য)
- নীলাব্জ চ্যাটার্জী (ইউনিভার্সিটি অফ অসলো, নরওয়ে)
- বিশেষ সহযোগিতায় – বিজয় আগরওয়ালা (টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা)

‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র সম্পাদনা - সূর্যকান্ত, শ্রীনন্দা, অর্ণব, অনির্বাণ ও রাজীবুল।

প্রচ্ছদ ও পত্রিকার নকশা - সূর্যকান্ত

ইপাব পত্রিকা : নীলাব্জ চ্যাটার্জী

মার্ভিন মিনস্কি: আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর পথিকৃৎ

সায়মিন্দু দাশগুপ্ত

যন্ত্রের, বিশেষ করে কম্পিউটারের বোধবুদ্ধি - ইংরেজিতে যাকে বলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (artificial intelligence) - নিয়ে গবেষণার ফলাফল আমরা চারিদিকেই দেখতে পাই। অচেনা শহরে বন্ধুর সাথে দেখা করতে হবে? নো প্রবলেম! পকেটের স্মার্টফোন-এ গুগল-ম্যাপ দেখিয়ে দেবে কোন বাস আর কোন ট্রেন ধরলে সবথেকে তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো যাবে। শোনা যাচ্ছে যে আর কয়েক বছরের মধ্যে গাড়ির চালকের আর দরকার হবে না - গাড়ি নিজেই নিজেকে চালাবে!

কল্পবিজ্ঞান লেখকরা অনেকদিন আগে থেকেই যান্ত্রিক বোধবুদ্ধি নিয়ে গল্প লিখেছেন। যেমন, ছোটবেলায় আমরা অনেকেই প্রফেসর শঙ্কুর যন্ত্রমানবদের কথা পড়েছি। এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণার শুরু মার্কিন বিজ্ঞানী মার্ভিন মিনস্কির (১৯২৭-২০১৬) গবেষণা দিয়ে। একটা বৈদ্যুতিন যন্ত্র বোধবুদ্ধির পরিচয় কিভাবে দিতে পারে, এই নিয়ে মার্ভিন চিন্তাভাবনা শুরু করেন পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে।

বোকা কম্পিউটার, চালাক কম্পিউটার

প্রথাগত ভাবে যখন আমরা কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখি, তখন সেই প্রোগ্রামে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলে দিই, কোন অবস্থায় কি করতে হবে। কম্প্যুটার-চালিত যন্ত্রমানবকে আমি যদি হঠাৎ করে বলি, "আমার বাগানের গাছগুলোতে একটু জল দিয়ে দাও তো", সে পড়বে অথই জলে। আমাকে

নির্দেশগুলো পরপর সাজিয়ে দিতে হবে। অনেকটা এরকম:

১. বাগানের উত্তর-দক্ষিণ কোণে যে কলটা আছে, সেটার সামনে যাও।

২. কলের মুখে একটা পাইপ লাগাও।

৩. কলটা চালু কর।

৪. পাইপের অন্য মুখটা নিয়ে বাগানের প্রত্যেকটা গাছের গোড়ায় সাড়ে-বাইশ সেকেন্ড ধরে জল দাও।

> কোন যন্ত্র যদি বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তাহলে তার নিজে থেকেই শেখার ক্ষমতা থাকা উচিত - এই ভাবনা থেকে মার্ভিনের যাত্রা শুরু।

এর পরেও, কলে যদি জল না থাকে, বা পাইপ-এ যদি ফুটো থাকে, যন্ত্রমানব কোন ভাবেই বুঝে উঠতে পারবে না কি করা উচিত। কোন যন্ত্র যদি বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তাহলে তার নিজে থেকেই শেখার ক্ষমতা থাকা উচিত - এই ভাবনা থেকে মার্ভিনের যাত্রা শুরু। আমার যন্ত্রমানব যদি বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তাহলে সে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নেবে "গাছে জল দেওয়া" মানে কি, আর দরকার মত ছোটখাটো সমস্যার (কলে জল নেই, ইত্যাদি) সমাধান কি বুঝে নিতে পারবে।

যেকোনো যন্ত্রকে অভিজ্ঞতা থেকে শেখানোর মধ্যে প্রধান একটা প্রযুক্তি হল স্নায়ুজাল, বা নিউরাল নেটওয়ার্ক (neural network)। আমাদের স্নায়ুর মধ্যে কোটি-কোটি নিউরন একে অপরের সঙ্গে কাটাকুটি খেলে (সাইনাপ্স বানিয়ে) একটা ভয়ানক ঘ্যাঁটপাকানো জাল বানিয়ে ফেলেছে। সেইরকম, স্নায়ুজালেও আমরা চেষ্টা করি সফটওয়্যারের মাধ্যমে কৃত্রিম নিউরন আর সাইন্যাপ্স-এর কাটাকুটি জাল বানানোর। এই জালের গঠন বদলাতে থাকে অভিজ্ঞতা (ট্রেনিং) থেকে, আর সেটাই যান্ত্রিক "শেখা" (মেশিন লার্নিং)।

বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম স্নায়ুজাল মার্ভিনের সৃষ্টি। ১৯৫১ সালে, ছাত্রাবস্থায় তিনি তৈরি করেন "SNARC" (Stochastic neural analog reinforcement calculator)। তখনও কম্পিউটারের প্রচলন হয়নি, হবে-হবে অবস্থায়, তাই মার্ভিন তাঁর স্নায়ুজাল তৈরি করেছিলেন বৈদ্যুতিন ভ্যাকুম টিউব আর যান্ত্রিক ক্লাচ ব্যবহার করে। এই স্নায়ুজালের মধ্যে ছিল চল্লিশটা কৃত্রিম স্নায়ু (নিউরন)। প্রত্যেক স্নায়ুর ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিকোষ (শর্ট টার্ম মেমরি) হিসাবে মার্ভিন ব্যবহার করেছিলেন একটা ক্যাপাসিটর, আর দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতিকোষ (লং টার্ম মেমরি) হিসাবে প্রত্যেকটি স্নায়ুর সঙ্গে জোড়া ছিল একটা পোটেনশিওমিটার, যার নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করত যান্ত্রিক ক্লাচ-টি।

এখনকার দিনে আমাদের আশেপাশে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (যান্ত্রিক বোধবুদ্ধি) প্রযুক্তি দেখতে পাই, সেগুলো বেশীরভাগই এরকম স্নায়ুজালের অত্যাধুনিক সংস্করণ। মার্ভিন কিন্তু শুধু স্নায়ুজালে থেমে থাকেননি। তাঁর পরবর্তী জীবনের কাজের মধ্যে দিয়ে তিনি বোঝার চেষ্টা করেছেন, অন্য কোনোভাবে আমরা বোধবুদ্ধির গঠনকে বুঝতে পারি কিনা। মার্ভিন বলতেন, যে কোনো জিনিসকে প্রকৃতপক্ষে বুঝতে গেলে, সেটাকে শুধু একভাবে বুঝলে চলবে না। তাঁর কাজে ও চিন্তাভাবনা মধ্যে দিয়েও সেটা সবসময় প্রকাশ পেয়েছে।

মনের সমাজ

যন্ত্র কিভাবে শিখবে, সেই নিয়ে ভাবতে ভাবতে তিনি কাজ শুরু করেন এম-আই-টি-র আর এক

প্রফেসর, সিমোর প্যাপার্ট-এর সঙ্গে। ছোট বাচ্চারা কিভাবে শিখতে পারে, মেতে যান সেই গবেষণায়। সিমোর আর মার্ভিন মিলে তৈরি করেন এক নতুন তত্ত্ব, মনের সমাজ (সোসাইটি অফ মাইন্ড)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষের বোধবুদ্ধির উৎপত্তি হয় অনেক ছোট ছোট বোধবুদ্ধিহীন অংশের আদানপ্রদান থেকে।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষের বোধবুদ্ধির উৎপত্তি হয় অনেক ছোট ছোট বোধবুদ্ধিহীন অংশের আদানপ্রদান থেকে।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, আমি একটা কাঠের টুকরো তুলে সেটাকে অন্য আরেকটা কাঠের টুকরোর উপর রাখতে চাই। খুদে বাচ্চারা তাদের দৈনন্দিন খেলাধুলার মধ্যে এরকম কাজ মাঝেমধ্যেই করে থাকে। কাজটা শুনে যতটা সহজ মনে হয়, মোটেই ততটা সহজ নয়। টুকরোটা সরাতে গেলে আমাকে প্রথমে দেখতে হবে চোখের সাহায্যে। তারপর কাঠের টুকরোটাকে মুঠো করে ধরতে হবে। সেটার জন্য চাই হাত, যাতে কিনা আঙুল লাগানো। তারপর টুকরোটাকে তুলতে হবে আর ঠিক জায়গায় নিয়ে গিয়ে হাল্কা করে ছেড়ে দিতে হবে। এগুলো যখন করছি, আমার আশেপাশের জগৎ সম্বন্ধেও কিছু তথ্য জানা ভালো - যেমন, টুকরোটার একদিক যদি ছুঁচোলো হয়, সেই দিকটা রাখার সময় নিচের দিকে থাকলে চলবে না। এই পুরো ব্যাপারটা কিভাবে ঘটে, সেটা বোঝার জন্য ষাটের দশকের শেষের দিকে মার্ভিন বেশ কিছু বছর ধরে একটা যান্ত্রিক হাত এবং চোখ বানানোর গবেষণায় মেতে ছিলেন। এখান থেকেই "মনের সমাজ" তত্ত্বের শুরু।

মার্ভিন বললেন, যে আমরা বোধ আর মন বলতে যা বুঝি, তার উৎপত্তি সহস্রকোটি "এজেন্ট"-দের মাধ্যমে। প্রত্যেকটা এজেন্ট শুধু একটাই কাজ করতে জানে। এই কাজগুলো এতটাই সহজ যে তার জন্য বুদ্ধি, অর্থাৎ আমরা বুদ্ধি বলতে যা বুঝি, সেটা লাগে না। আমি যদি কাঠের টুকরো সরাই, তাহলে সেই সরানোটা "দেখা", "আঙুল পাকানো", "হাত তোলা", "হাত সরানো", "ছেড়ে দেওয়া", ইত্যাদি এজেন্টদের সম্মিলিত কেরামতি।

আরো মার্ভিন

১৯৫৮ সালে মার্ভিন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-তে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন, এবং ১৯৫৯ সালে জন ম্যাককার্থি-র সাথে এম-আই-টির আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ল্যাবরেটরি স্থাপন করেন। এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ল্যাবরেটরি বর্তমানে এম-আই-টির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ল্যাবরেটরি-র (CSAIL-এর) অন্তর্ভুক্ত। মার্ভিনকে অনেকেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর জনক হিসাবে গণ্য করেন, কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে মার্ভিনের অবদান শুধু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এ থেমে থাকেনি। যান্ত্রিক স্নায়ুকোষ বানাতে হলে সত্যিকারের (অযান্ত্রিক) স্নায়ুকোষ ঘেঁটে দেখা প্রয়োজনীয়, আর তার জন্য দরকার উন্নত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের। এই জন্য ১৯৫৭ সালে মার্ভিন এক নতুন ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র বানিয়ে ফেললেন - এই ধরণের যন্ত্রকে আমরা আজ কনফোকাল মাইক্রোস্কোপ বলে চিনি।

গানবাজনা নিয়েও গভীরভাবে চিন্তা করেছেন মার্ভিন। বলতেন, "যেমন আমরা খেলনা ব্লক নানাভাবে সাজিয়ে, ফেলে দিয়ে, স্পেস সম্বন্ধে শিখি, সেইভাবে সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে আমরা সময়

নিয়ে খেলা করি। একটা সময়ের টুকরোকে তুলে নিয়ে কি আমরা অন্য টুকরোর মধ্যে গুঁজে দিতে পারি? যদি পাশাপাশি রাখি? তাহলে কেমন হয়? এর উত্তর সঙ্গীতচর্চায় মেলে।" গানবাজনা নিয়ে তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনায় থেমে থাকেননি মার্ভিন। মাঝেমাঝেই তাঁকে দেখা যেত মিডিয়া ল্যাবের একতলায় একমনে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছেন।

জীবনকালে অনেক উপাধি, অনেক পুরস্কার পেয়েছেন মার্ভিন। কম্পিউটার সায়েন্সের সর্বোচ্চ সম্মান "টিউরিং অ্যাওয়ার্ড" মার্ভিনকে দেওয়া হয় ১৯৬৯ সালে। কিন্তু মার্ভিনের সবচেয়ে গভীর প্রভাব টের পাওয়া যায় তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দিয়ে। মার্ভিনের ছাত্রছাত্রীরা আজকে কম্পিউটার সায়েন্স ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের গবেষণায় দিকপাল। নানা ভাবে, গবেষণার নানা জায়গায় তাঁরা গভীর ছাপ ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, অনেকসময় তাঁরা গবেষণায় থেমে থাকেননি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ নিয়ে গবেষণার ফল পৌঁছে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছে। উদাহরণস্বরূপ, মার্ভিনের ছাত্র ড্যানি হিলিস মাসিভলি প্যারালাল কম্পিউটিং (massively parallel computing) নিয়ে তাঁর পি-এইচ-ডি গবেষণার ফল অন্যান্য গবেষকদের কাছ পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্থাপণ করেন "থিঙ্কিং মেশিনস কর্পোরেশন"। এই সংস্থার "কানেকশন মেশিন-৫" সুপারকম্পিউটার ১৯৯৩ সালে বিশ্বের সবথেকে তাগড়াই কম্পিউটারের খেতাব পায়। ড্যানি হিলিস পরে এক জায়গায় বলেছেন, "মার্ভিন আমাকে চিন্তা করতে শিখিয়েছেন"।

জীবনের শেষ দিন অবধি মার্ভিন এই ধরণের প্রায় শিশুসুলভ কৌতুহল আর রসিকতা নিয়ে জগৎটাকে বোঝার চেষ্টা করে গেছেন।

কয়েক মাস আগে, মিডিয়া ল্যাবের তিরিশ বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে মার্ভিনকে একটা ভাস্কর্য উপহার দেওয়া হয়। উপহার পেয়ে মার্ভিনের প্রশ্ন, "ওমা, কি সুন্দর জিনিস। এটা কি করে?" জীবনের শেষ দিন অবধি মার্ভিন এইধরণের প্রায় শিশুসুলভ কৌতুহল আর রসিকতা নিয়ে জগৎটাকে বোঝার চেষ্টা করে গেছেন। বোঝার জিনিসটা তাঁর গবেষণার আওতায় পড়ে কি পড়ে না, তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাননি। এর ছোঁয়াচ মার্ভিনের সহকর্মী আর ছাত্রদের মধ্যেও টের পাওয়া যায় - আর এটাই হয়তো মার্ভিনের সব থেকে বড় অবদান।

লেখক পরিচিতি :

সায়মিন্দু দাশগুপ্ত এম.আই.টি. মিডিয়া ল্যাব-এর ছাত্র। মিডিয়া ল্যাব-এ 'লাইফলং কিন্ডারগার্টেন' গবেষক দলটির সদস্য সায়মিন্দু। 'স্ক্র্যাচ' নামক শিশুদের উপযোগী একটা প্রোগ্রামিং ভাষা নিয়ে তার গবেষণা।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2016/03/15/marvin-minsky/

প্রচ্ছদের ছবি: উইকিপিডিয়া

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের দেখা মিললো

শাওন ঘোষ ও রাজীবুল ইসলাম

|| উপক্রমণিকা ||

কিছুদিন আগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লাইগো (LIGO) ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা জানালেন যে তাঁদের যন্ত্রে ধরা পড়েছে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। ১৩০ কোটি বছর আগে দুটি বিশালকায় ব্ল্যাকহোল একে অপরের চারিদিকে প্রবল গতিতে ঘুরতে ঘুরতে ছাড়ছিল সেই তরঙ্গ। এত বছর পর পৃথিবীতে বসে আমরা দেখলাম সেই তাণ্ডবের ছবি। এই রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে তিনটি পর্বে। প্রথম পর্বে থাকছে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের সীমাবদ্ধতা এবং আইনস্টাইনের হাত ধরে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মহাকর্ষকে বোঝার চেষ্টা। মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ধারণাও এসেছে আইনস্টাইনের এই সাধারণ অপেক্ষবাদের হাত ধরে। দ্বিতীয় পর্বে থাকছে, লাইগো যন্ত্র কিভাবে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরতে সক্ষম হল তার বর্ণনা। আর শেষ পর্বে থাকছে, বিজ্ঞানীরা কি করে নিশ্চিত হলেন যে তাদের যন্ত্রের সিগন্যাল মহাকর্ষীয় তরঙ্গের জন্যই, আরও হাজারটা অন্য কারণের জন্য নয়। সেই সাথে থাকছে ভবিষ্যতের কিছু দিশার কথা।

|| পর্ব ১: স্থানকালে দোলা ||

গোড়ার কথা: নিউটন থেকে আইনস্টাইন

আইজ্যাক নিউটন বসে ছিলেন আপেল গাছের তলায়। হঠাৎ এক আপেল এসে পড়ল তাঁর মাথায়। ব্যাস, 'দিমাগ কি বাত্তি' জ্বলে উঠল নিউটনের! ভেবে ফেললেন মহাকর্ষ (gravitation)-এর কথা। এটা একটা জনপ্রিয় গল্প। সত্যি কি না – তা বিচার করবেন বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাঁরা। কিন্তু, যে কথায় কোনো ভুল নেই তা হল – কোনো বস্তুর ভর থাকলে, আরেকটা ভরযুক্ত বস্তুকে সে মহাকর্ষের জন্য কাছে টানে। তাই, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে, ঋতু পরিবর্তন হয়। বরফগলা জলের ধারা নদী হয়ে নেমে আসে পাহাড়-পর্বত থেকে। আবার মহাকাশে যেতে হলে রকেটে চাপতে হয়।

স্কুলের পাঠ্য বইয়ে মহাকর্ষের পাঠ শুরু হয় নিউটনের সূত্র দিয়ে। সূত্রটি হল:

$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$

এই সূত্র দিয়ে M ও m বিন্দুভরের দুটি বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষ বল F অঙ্ক কষে আমরা সহজেই বের করতে পারি। ভর ছাড়াও জানতে হয় তাদের মধ্যেকার দূরত্ব (r)। এখানে G হল মহাকর্ষীয় ধ্রুবক। মহাকর্ষ বল দুটি ভরকে পরস্পরের দিকে টানে। নিউটনীয় তত্ত্ব পৃথিবীর বেশীরভাগ ঘটনা ব্যাখ্যা করতেই যথেষ্ঠ। তবে এটা হল, যাকে বলে আসন্নায়ন (approximation)। যা একদম নিখুঁত সত্যি নয়, কিন্তু আমাদের চেনাপরিচিত পরিবেশে, যেমন পৃথিবীর বুকে, তার বাইরে কিম্বা ভূগর্ভেও খাটে। তবুও, মহাকর্ষের এই নিউটনীয় ধারণা কিছু কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। আলোর ভর নেই, তাই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী আলোর উপর মহাকর্ষ বল থাকা উচিত নয়। কিন্তু, জ্যোতির্বিদ্যার পরীক্ষায় দেখা যায় যে মহাকাশে খুব ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে আসার সময় আলোর গতিপথ বেঁকে গেছে! আরেকটি উদাহরণ হল বুধ গ্রহের অনুসূর গতি (perihelion of mercury)। দেখা যায় যে সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করার সময় বুধ গ্রহের কক্ষপথের অনুসূর বিন্দু (অর্থাৎ কক্ষপথের যে বিন্দুটি সূর্যের সবথেকে কাছে) ধীরে ধীরে সরতে থাকে। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব অনুসূর গতির পরীক্ষালব্ধ ফল কে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এমনিতে, খুব ভারী এবং ঘন বস্তুর খুব কাছে চলে গেলে সেক্ষেত্রে নিউটনের মহাকর্ষ বলের ধারণা আর প্রযোজ্য হয় না।

তখন আমাদের আইনস্টাইনের সাধারণ অপেক্ষবাদ (general relativity) শরণাপন্ন হতে হয়। এখনও পর্যন্ত যতগুলো পরীক্ষা হয়েছে, তা সে হাল্কা বা ভারী যে কোনো বস্তুর মহাকর্ষই হোক না কেন, সবেতেই সাধারণ অপেক্ষবাদ সসম্মানে উত্তীর্ণ। এই সাধারণ অপেক্ষবাদ নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের বদলে শুধু একটা নতুন সূত্র দেয় তাই নয়, এই তত্ত্ব মহাকর্ষকে নতুন দিক থেকে ভাবতে শেখায়। এই তত্ত্ব স্থান-কালের জ্যামিতিকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে।

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র পৃথিবী বা তার বাইরে বেশিরভাগ জায়গাতেই খেটে গেলেও কিছু ঘটনা ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয় । ছবির উৎস: http://theconversation.com/

স্থান আর কাল মিলে স্থান-কাল

এখন নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে মনে যে ‘স্থান-কালের জ্যামিতি’ কথার মানে কি? আইনস্টাইন বুঝেছিলেন যে কোন বস্তু কোথায় আছে সেটা ঠিক ভাবে বর্ণনা করতে হলে শুধু সে স্থান অর্থাৎ space-এর ঠিক কোথায় আছে বললেই চলবে না, একই সাথে সময়টাও বলতে হবে। অর্থাৎ স্থানিক তিন মাত্রার (three spatial directions) সাথে সময় বা কাল মিলে চার-মাত্রার স্থান-কাল তৈরি করে। আর শুধু স্থানের জ্যামিতি - যেমন একটা পিঁপড়ে গোলকের উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে - তা নিয়ে আলোচনা করার বদলে আলোচনা করতে হবে এই চার-মাত্রার স্থান-কালের গাণিতিক রূপ বা জ্যামিতিক রূপ নিয়ে।

> স্থান আর সময় বা কালকে আলাদা করে - ভাবা যায় না কারণ কোন বস্তুর গতির উপর সময় কিভাবে বইছে। নির্ভর করে তার

স্থান আর সময় বা কাল-কে আলাদা করে ভাবা যায় না। তার কারণ হল, কোন বস্তুর গতির উপর নির্ভর করে তার সময় কিভাবে বইছে। উদাহরণ হিসাবে দুটো ঘড়ির কথা বলা যাক - লাল ঘড়ি আর নীল ঘড়ি। ঘড়িদুটো এমন যে প্রতি সেকেণ্ডে একটা করে আলোর স্পন্দন (pulse) ছাড়ে। দুটোই প্রথমে টেবিলের উপর ছিল আর একদম একই সময় দিত। অর্থাৎ লাল ঘড়ির এক সেকেণ্ড আর নীল ঘড়ির এক সেকেণ্ড একদম সমান। এবার নীল ঘড়িকে একটা

রকেটে চাপিয়ে দেওয়া হল। সে প্রবল গতিতে আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু তার থেকে যে আলোর স্পন্দন বেরোচ্ছে তা আমার চোখে (বা যন্ত্রে) ধরা পড়ছে।

যেহেতু লাল ঘড়িটি আমার কাছেই রয়েছে, অবশ্যই আমি এক সেকেণ্ড অন্তর একটা আলোর স্পন্দন দেখব। নীল ঘড়ির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু একটু আলাদা। রকেট আর নীল ঘড়িটি প্রবল গতিবেগে আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই, সেকেণ্ডে একটা আলোর স্পন্দন ছাড়ার মাঝে সে নিজে অনেকটাই আমার থেকে দূরে সরে গেছে। এক্ষেত্রে স্পন্দনটা কিছুটা অতিরিক্ত দূরত্ব অতিক্রম করে (ঠিক আগের স্পন্দনটার তুলনায়) তবেই আমার আমার কাছে এসে পৌঁছবে। তাহলে আমি কি দেখব? পৃথিবীতে বসে আমি দেখব যে নীল ঘড়িটি এক সেকেণ্ডের একটু বেশি সময় অন্তর স্পন্দন ছাড়ছে। অর্থাৎ, সেটা 'স্লো' হয়ে গেছে। একটু ভাবলেই স্পষ্ট হবে যে, এটা কিন্তু খুবই গভীর এবং মৌলিক (Fundamental) ব্যাপার। এর মানে কিন্তু এই নয় যে চলমান ঘড়ি 'খারাপ' হয়ে গেছে, তাই স্লো চলছে।

এখন যদি এমন কোন সংকেত বা সিগন্যাল থাকত যার গতিবেগ অসীম, তাহলে এই সমস্যা হত না। ঘড়ি দুটোকে এমন ভাবে তৈরি করতাম যে 'এক সেকেণ্ড' অন্তর অন্তর সে আলোর বদলে ওই সংকেত ছাড়তো। যেহেতু তার গতিবেগ অসীম, তাই সেই সংকেত ঘড়ি থেকে আমাদের চোখে (বা কোন যন্ত্রে) এসে পৌঁছতে কোন সময় নিত না। আর তাই নীল ঘড়ি মাটিতেই থাক আর রকেটেই থাক, তার এক সেকেণ্ডের কোন তফাৎ হত না।

এখানেই মুশকিল! বাস্তবে শূন্যস্থানে আলোর গতিবেগের থেকে বেশি গতিবেগে কোন সংকেত চলে না। নিউটন এই সত্যটা বুঝতে পারেননি। আর তাই, তাঁর দেওয়া গতিসূত্রে ব্যবহৃত সময় হল absolute, সব ঘড়ির এক সেকেণ্ড সমান। ১৯০৫ সালে বিশেষ অপেক্ষবাদে (special relativity) আইনস্টাইন সেই যুক্তিকে খণ্ডন করলেন।

> বাস্তবে শূন্যস্থানে আলোর গতিবেগের থেকে বেশি গতিবেগে যে কোন সংকেত চলে না, নিউটন এই সত্যটা বুঝতে পারেননি।

এখানে মাথায় রাখতে হবে, এর ফলে নিউটনের গতিসূত্র কিন্তু একেবারে বাতিল হয়ে গেল না। ছাদ থেকে ঝোলানো একটা পেণ্ডুলাম কিভাবে দুলছে সেটা বুঝতে বা ব্রিজ তৈরি করতে যে মেকানিক্সের জ্ঞান লাগে, তা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র দিয়েই চলে যায়, কারণ এই পেণ্ডুলামের গতিবেগ আলোর গতিবেগের তুলনায় নগন্য। আইনস্টাইন দেখালেন কোন বস্তু যখন খুব জোরে (যা আলোর গতির তুলনায় নগন্য নয়) ছুটতে থাকে, তখন নিউটনের গতিসূত্র একেবারেই খাটে না।

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের একটি সমস্যা

এবার মহাকর্ষ সূত্রের কথায় ফিরে আসা যাক। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র, যা উপরে বাক্সের মধ্যে লেখা আছে, তার দিকে একবার ভাল করে তাকানো যাক। এই সূত্রে সময়ের উল্লেখই নেই! ধরা যাক, M আর m ভরের বস্তুদুটোর মধ্যে অনেক দূরত্ব, এতটাই যে তাদের একটার থেকে আরেকটায় যেতে আলোর সময় লাগে এক মিনিট। M ভরের বস্তুটি আমার কাছে আছে, আমি হঠাৎ করে তাকে একটু

সরিয়ে দিলাম। তাহলে দূরত্ব r পালটে গেল কিছুটা। এখন প্রশ্ন হল, কতক্ষণ পর m ভরের

> **নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে সময়ের উল্লেখই নেই!**

বস্তুটি জানতে পারবে যে অন্য বস্তুটা সরে গিয়েছে আগের জায়গা থেকে?

নিউটনের সূত্র (বাক্সের মধ্যে দেওয়া সমীকরণ) অনুযায়ী আমার M ভরের বস্তুটাকে সরানোর খবর m ভরের বস্তু সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে। কারণ, মহাকর্ষ বল F পালটে গেছে ততক্ষণে। তাহলে, আমি M ভরের বস্তুটাকে ঠিকভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে আমার যে বন্ধু m ভরের বস্তুর কাছে বসে আছে, তাকে যদি কোনো সংকেত পাঠাই, সে সংকেত অসীম গতিবেগে তার কাছে পৌঁছে যাবে তৎক্ষনাৎ!

আবার সেই সমস্যা! মহাবিশ্বে অসীম গতিবেগে কোন সংকেত যায় না। তাই, নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অসম্পূর্ণ।

প্রশ্নটা তাহলে থেকে যাচ্ছে, মহাকর্ষ পরিবর্তনের খবর এক বস্তু থেকে আরেক বস্তুতে কিভাবে পৌঁছোয়?

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ

সমস্যার সমাধান করলেন আইনস্টাইন। তিনি মহাকর্ষকে একটা বল (ফোর্স) হিসাবে না ভেবে স্থান-কালের জ্যামিতির পরিবর্তন হিসাবে ভাবলেন।

সাধারণ অপেক্ষবাদে (general relativity) আইনস্টাইন বললেন, ভারী বস্তুর উপস্থিতিতে স্থান-কাল কুঁচকে যায় (বিজ্ঞানীদের ভাষায় একে বলে,

> **সাধারণ অপেক্ষবাদে আইনস্টাইন বললেন, একটা ভারী বস্তুর উপস্থিতিতে স্থান কাল-কুঁচকে যায়।**

স্থান-কালের বক্রতা বা spacetime curvature)। এই স্থান-কাল কুঁচকে যাওয়া ব্যাপারটার ধারণা

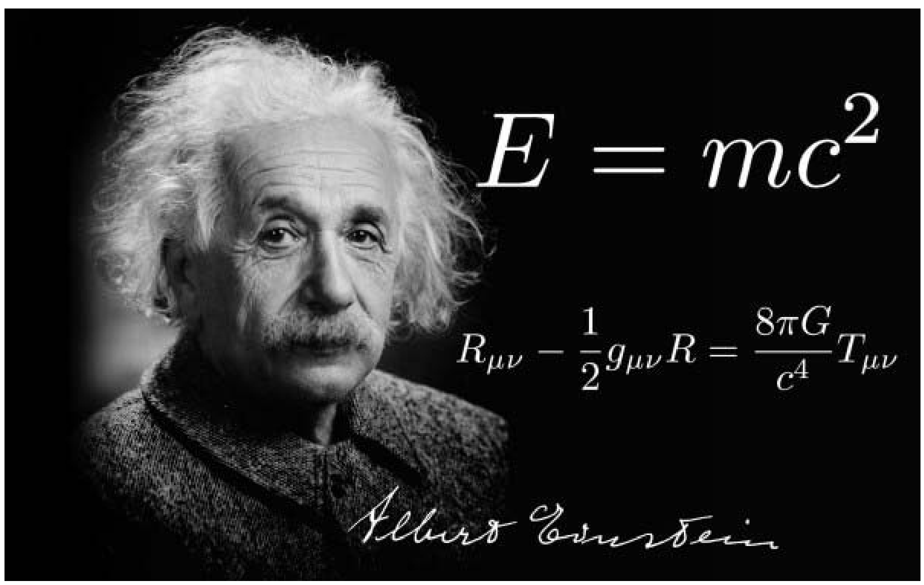

আইনস্টাইন সাধারণ অপেক্ষবাদে (general relativity) মহাকর্ষকে নতুন ভাবে ভাবতে শেখালেন, যা নিউটনের সূত্রের অসম্পূর্ণতা দূর করল। ছবির উৎস: http://www.schuetky.com/physik/

করা বেশ শক্ত। স্থান কুঁচকে যাওয়া আমরা তাও কল্পনা করতে পারি, কিন্তু সময় কুঁচকে যাওয়া মানে কি তা কল্পনা করা মুশকিল। অঙ্কের সাহায্য ছাড়া তাই সাধারণ অপেক্ষবাদ ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। যদিও, নিচে একটি বহুল প্রচলিত উপমা দেওয়া হল। পাঠক খেয়াল রাখবেন, এটা কিন্তু শুধুই একটা উপমা।

উপমাটা এরকম - ধরুন, একটা ত্রিপল টানটান - করে টাঙানো হলো চারটে খুঁটিরমধ্যে। একটা লোহার বল সযত্নে তার মধ্যিখানে রেখে দেওয়া হলো। অমনি ত্রিপলটা মাঝখানে ঝুলে পড়বে। এবার ওই ত্রিপলে একটা পিংপং বল ছেড়ে দিলে, যেখানেই ছাড়ি না কেন, পিংপং গড়িয়ে লোহার বলের দিকে আসবে। এবার একটা পিঁপড়ের কথা ভাবুন, যে ওই ত্রিপলটায় উপর গুটিগুটি এগোচ্ছে। সে আশেপাশে যেটুকু দেখতে পাচ্ছে, তাতে তার মনে হচ্ছে, সে সমতল ভূমিতে হাঁটছে। সে ভাবছে - 'ওমা, লোহার বলটা টেনে নিলো পিংপং বলটাকে।' সে তো আর বুঝতে পারছে না, ত্রিপলটা মাঝখানে ঝুলে পড়েছে। সে দেখলো, 'সমতল' ভূমিতে একটা বল আরেকটার দিকে "আকৃষ্ট" হলো।

এখানে পাঠক ভাবতেই পারেন যে ত্রিপলটা ঝুলে পড়ল কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের জন্য লোহার বলের ওজন আছে। শূন্যস্থানে (মানে যেখানে মাধ্যাকর্ষণ নেই, সেখানে) ত্রিপলটা ঝুলবে না তার উপর ভারী একটা লোহার বল ছেড়ে দিলেও। একদম ঠিক। সেজন্যই আমরা পাঠকদের মনে করিয়ে দিচ্ছি আবার যে এই ছবিটা কেবল একটা উপমা। এইটুকু বলার জন্য যে ভারী বস্তুর জন্য স্থান-কালের জ্যামিতির পরিবর্তন হয়।

এই উপমায় আমরা অনেকটা পিঁপড়েটার মত। আর এই ত্রিপলটা চারমাত্রার স্থান-কাল। চতুর্মাত্রিক স্থানকালের বক্রতা আমরা দেখতে পাই না, কারণ আমরা তার মধ্যেই বসে আছি। শুধু দেখি দুটো ভরযুক্ত বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করছে, আর আমরা তাকেই বলি মহাকর্ষ। যত ভারী বস্তু, স্থানকালের পর্দায় তত গভীর খাদ সৃষ্টি করে সে। যত বেশি তার ঘনত্ব, সেই খাদের ঢাল হয় ততটাই বেশি।

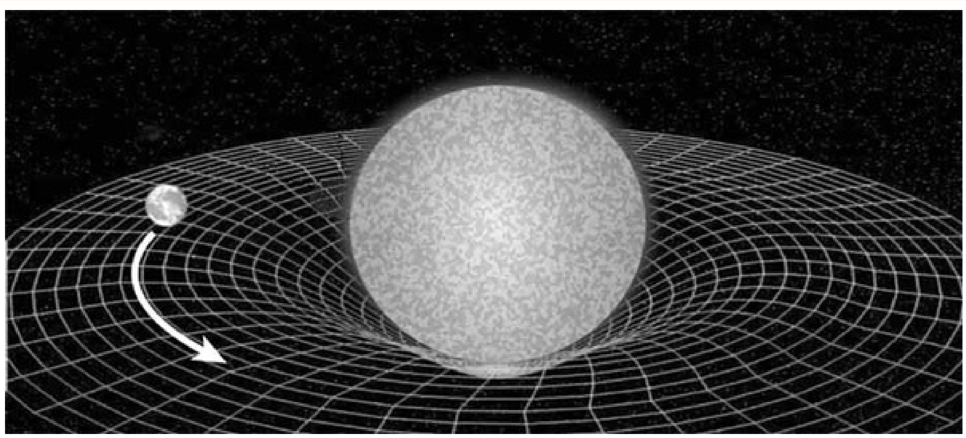

স্থানকালের বক্রতা বোঝাতে একটি চিত্র। ছবিটিতে দ্বিমাত্রিক (two-dimensional) স্থান দেখানো হয়েছে। আসলে স্থানকালের বক্রতা কিন্তু চার মাত্রায় ঘটে। ছবির সূত্র: http://www.uh.edu/

আইনস্টাইনের মহাকর্ষ সূত্রে এই স্থান-কালের বক্রতা চলে আসে। কোন বস্তুর ভর জানা থাকলে সে স্থান-কালে কতটা বক্রতা তৈরি করে, তার হিসেব কষা যায়। আমাদের আশেপাশের সাধারণ বস্তু, এমনকি সূর্যও এতটাই কম স্থান-কালের বক্রতা তৈরি করে যে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র খুব ভাল ভাবেই খেটে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তাই এই ক্ষেত্রে স্থান আর কাল বা সময়কে আলাদা করে ভাবলে ক্ষতি হয় না (যদি না বস্তুটি আলোর গতিবেগের কাছের বেগ নিয়ে ছোটে, সেক্ষেত্রে বিশেষ অপেক্ষবাদ নিয়ে ভাবতে হয়, আর সেক্ষেত্রে স্থান-কালকে একসাথে ভাবতে হয়)।

কিন্তু, মৃতপ্রায় নক্ষত্রদের ক্ষেত্রে এই স্থানকালের বক্রতা খুব স্পষ্টভাবে চেনা যায়। মৃতপ্রায় নক্ষত্র জ্বালানীর অভাবে সংকুচিত হতে থাকে । তাই তার ঘনত্বও বাড়তে থাকে। কিছু নক্ষত্র শেষকালে কৃষ্ণগহ্বরে (black hole) পরিণত হয়। আকার ছোট হওয়ার ফলে দুটো কৃষ্ণগহ্বর মহাকর্ষের টানে একে অপরকে না ছুঁয়েও খুব কাছে চলে আসতে পারে। এরকম হলে আর সোজাসুজি ধাক্কা না খেলে, কৃষ্ণগহ্বর দুটো খুব ছোট কক্ষপথে একে অপরের চারিদিকে ঘুরপাক খেতে থাকে। পেল্লায় ভর, ক্ষুদ্র কক্ষপথের ব্যাস – অঙ্কটা কষলে দেখা যায় যে তাদের গতি প্রায় আলোর গতিবেগের কাছাকাছি চলে যেতে পারে।

অর্থাৎ, মৃতপ্রায় নক্ষত্রদের উপস্থিতিতে স্থান-কালের পর্দায় একটা বিশাল গহ্বরের সৃষ্টি হয়। আর দুটো গহ্বর এরকম ভয়ানক গতিতে ঘুরপাক খেলে, প্রতি মূহুর্তে স্থান-কালের পর্দার রূপ পালটাতে থাকে। পুকুরে ব্যাঙ লাফালাফি করলে যেমন ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি এই ব্ল্যাকহোলের নাচানাচিতে স্থান-কালের পর্দায় তরঙ্গ তৈরি হয়। একেই বলে মহাকর্ষ তরঙ্গ।

আইনস্টাইনের অপেক্ষবাদ এই মহাকর্ষ তরঙ্গের ভবিষ্যদ্বাণী করলেও এতদিন তা সরাসরি দেখা যায়নি। উপরের উদাহরণে স্থান-কালের ঢেউ উৎস থেকে বহুদূর পেরিয়ে যখন আমাদের কাছে এসে পৌঁছোয়, তার বিস্তার (অ্যাম্প্লিচুড) খুবই কমে গেছে। তাই একে সনাক্ত করা দুরূহ ব্যাপার। এই আপাত দুঃসাধ্য কাজই করেছে বিজ্ঞানীরা। LIGO নামক যন্ত্রের সাহায্যে।

|| পর্ব ২: এক তরঙ্গের হদিশ আরেক তরঙ্গ দিয়ে ||

মহাকর্ষকে আইনস্টাইন সাধারণ অপেক্ষবাদে স্থান-কালের জ্যামিতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করলেন। এই ধারণার সাথে স্বাভাবিকভাবেই চলে এল মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ধারণা। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ হল স্থান-কালের পর্দার দোলা। দূরন্ত গতিতে, প্রবল ত্বরণ সহ ঘুরে চলা বিশাল ভরের বস্তু, যেমন 'তাণ্ডবময়' ব্ল্যাকহোল-যুগল, তাদের কিছুটা শক্তি এই তরঙ্গে রূপান্তরিত হতে পারে। সেই মহাকর্ষ তরঙ্গ স্থান-কালকে দোলা দিতে দিতে ছুটে চলে চারিদিকে, ছুটে আসে আমাদের এই পৃথিবীর দিকে। স্থান-কালের পর্দার জ্যামিতি পরিবর্তন করতে লাগে অনেক শক্তি। তার উপর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ যখন বহু কোটি আলোকবর্ষ অতিক্রম করে পৃথিবীতে এসে পৌঁছোয়, তখন তার আস্ফালন কমে প্রায় শূন্য হয়ে যায়।

ফলে প্রশ্ন থেকেই যায়: আমরা কি পারব সেই অতিক্ষীণ মহাকর্ষীয় তরঙ্গের আভাস পেতে?

উত্তরটা এখন আর অজানা নয়। গত বছর, অর্থাৎ ২০১৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দুটো বিশালকায় যন্ত্র, যাদের নাম হল লাইগো (LIGO, Laser Interferometer Gravitation-wave Observatory), ক্ষণিকের জন্য নড়ে উঠেছিল। অনেক কাটা-ছেঁড়ার পর বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এলেন, এ অতি-দুর্বল ভূমিকম্প নয় বা কোন গাড়ী এসে ল্যাবরেটরির বাইরের দেওয়ালে ধাক্কা মেরেছে তা নয়, এমনকি আরও হাজারটা কারণ যার জন্য যন্ত্রদুটো নড়ে উঠতে পারে তার কোনটাই নয় – এই নড়নকে ব্যাখ্যা করতে পারে একমাত্র মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। চাঁদে মানুষের প্রথম পা রাখার মত একটা ইতিহাস তৈরি হল, আমাদের পৃথিবীতে বসেই। মানবজাতি মহাবিশ্বের সুদূরে বহুবছর আগে ঘটে যাওয়া এক মহাজাগতিক ঘটনার সংকেত হাতে-নাতে ধরতে পারল। আর মহাকর্ষীয় তরঙ্গ প্রথমবারের জন্য শনাক্ত হল।

শনাক্ত করার যন্ত্রপাতি

কেঁচো যেমন একবার সঙ্কুচিত আবার প্রসারিত হতে হতে এগিয়ে চলে, মহাকর্ষীয় তরঙ্গও ঠিক সেইভাবে স্থান-কালকে সঙ্কুচিত প্রসারিত করতে করতে এগিয়ে চলে। সাধারণ অপেক্ষবাদ দিয়ে এই স্থান-কালের সংকোচন-প্রসারণের অঙ্কটা কষলে দেখা যায়, স্থান-কালে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ফলে একটা টান (Strain) তৈরি হয়। অর্থাৎ, কোন অঞ্চল দৈর্ঘ্যে যত বড়, মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ফলে তার দৈর্ঘ্যে তত বেশী পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞানীরা তাই মাঠে নামলেন স্থান-কালের স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় এই পরিবর্তন বা টান মাপতে।

লাইগো-র আগেও মহাকর্ষীয় তরঙ্গ দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

লাইগো-ই কিন্তু মহাকর্ষীয় তরঙ্গ দেখার প্রথম চেষ্টা নয়। ষাটের দশকের শেষের দিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মেরীল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জোসেফ ওয়েবার পিয়েজোইলেকট্রিক স্ফটিকের সাহায্যে সেই টান মেপে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে এই পরীক্ষায় সক্ষমও হয়েছেন। তাঁর এই দাবির পর

বিশ্বজুড়ে পরীক্ষাটি পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা হলো। তাঁর তৈরী যন্ত্রটার নাম দেওয়া হলো 'ওয়েবার বার'। কিন্তু আর কোথাও ওয়েবার বার-এ মহাকর্ষ তরঙ্গের অতিক্ষীণ সিগন্যালও ধরা পড়লো না। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ মাপার প্রথম চেষ্টা করার জন্য ওয়েবার বিজ্ঞানী মহলে গৌরব অর্জন করলেও তাঁর দাবিটা বিজ্ঞানীমহলে তেমন স্বীকৃতি পেলো না।

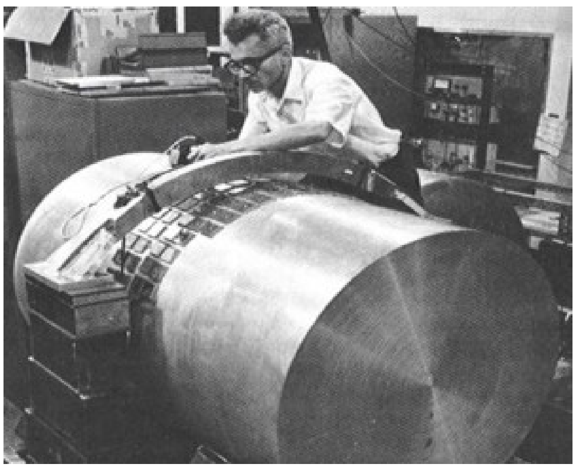

প্রফেসর ওয়েবার কাজ করছেন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরার যন্ত্রের উপর। যন্ত্রটি সফল হয়নি, কিন্তু একটা ভিত গড়েছিল পরবর্তী প্রজন্মের যন্ত্রের জন্য। ছবির সূত্র: http://www.physics.umd.edu/

লাইগো যেভাবে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ মাপতে পেরেছে, তার সূচনাটা বেশ মজার এবং বিশেষত শিক্ষকদের জন্য অনুপ্রেরণার। ১৯৬৭ সালে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (MIT)-র অধ্যাপক রাইনার ওয়াইস-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগ থেকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হলো – ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ অপেক্ষবাদের একটা কোর্স পড়ানোর। রাইনার ছিলেন একজন এক্সপেরিমেন্টালিস্ট, মানে যাদের কাজ হাতে কলমে পরীক্ষানিরীক্ষা করা। সাধারণ অপেক্ষবাদ তত্ত্বের উপর তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। কিন্তু, ডিপার্টমেন্টের দেওয়া এই চ্যালেঞ্জ তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং ভাবতে শুরু করলেন এমন একটা সম্ভাব্য পরীক্ষার কথা, যা নিয়ে উনি ছাত্রছাত্রীদের সাথে আলোচনা করতে পারবেন। তিনি এমন একটা সহজ পরীক্ষা করতে চাইলেন যা দিয়ে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের শনাক্তকরণ সম্ভব।

তাঁর প্রথম চিন্তা ছিল এইরকম – ধরা যাক, দুটো বস্তুর (যেমন আয়নার) মধ্যে আলো যাতায়াত করছে। আমাদের কাছে এত সূক্ষ্ম একটা ঘড়ি আছে যে এক বস্তু থেকে আরেক বস্তু পর্যন্ত যেতে আলোর কত সময় লাগে, তা নিঁখুতভাবে জানতে পারি। এবার একটা মহাকর্ষ তরঙ্গ ওই যন্ত্রের উপর পড়ল। মহাকর্ষ তরঙ্গের প্রভাবে স্থান-কাল কুঁচকে যায়। ওই দুই বস্তুর মধ্যে যাতায়াত করতে আলোর স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় একটু আলাদা সময় লাগবে কারণ সেই আলো স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় ভিন্ন পথ অতিক্রম করবে। আমাদের ঘড়ি জানিয়ে দেবে এই সময়ের সামান্য পরিবর্তনের কথা। ব্যাস, বুঝে ফেললাম মহাকর্ষ তরঙ্গের কথা!

> যদি খুব সূক্ষ্ম একটা ঘড়ি থাকত, তাহলে আলোর যাতায়াত করার তফাৎ থেকেই মেপে ফেলা যেত মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রভাব।

কিন্তু, মুশকিল হল – এমন সূক্ষ্ম ঘড়ি এখনও আবিষ্কার হয়নি যা মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রভাবে সামান্য সময়ের তফাৎ ধরে ফেলতে পারবে। তার উপর, এই দুটি আয়নার মধ্যের দূরত্ব আরও অনেক কারণে পাল্টাতে পারে। তাই সেটা যে মহাকর্ষীয়

তরঙ্গেরই প্রভাব, তা আলাদা করে বোঝাটাও সমস্যার।

তাহলে উপায় কি? রাইনারের ভাবনা থেকে (সেইসঙ্গে সমসাময়িক অন্য কিছু বিজ্ঞানীর চিন্তাভাবনা থেকে) বেরিয়ে এল ইন্টারফেরোমেট্রির ধারণা। একটা খুব সূক্ষ্ম ইন্টারফেরোমিটার দিয়ে স্থান-কালের অতি ক্ষীণ আলোড়ন মাপা যেতে পারে। এর সাথে যুক্ত হল ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (ক্যালটেক) তাত্ত্বিক পদার্থবিদ কিপ থর্ণের উৎসাহ আর উদ্যম। বিজ্ঞানীরা আশান্বিত হয়ে উঠলেন যে হয়ত এবার সত্যি সত্যিই অধরা মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে হাতে নাতে ধরা যাবে।

এই ইন্টারফেরোমেট্রির মূল ধারণাটি খুব সহজ। ইন্টারফেরোমিটারে দুটি পথে আলো চলাচল করে আর সরাসরি মেপে ফেলা যায় পথ দুটি যেতে সময়ের পার্থক্য। এক একটা পথ পরিক্রমা করতে আলোর কত সময় লেগেছে, তা আলাদা করে মাপতে হয় না। এই দুটো পথ একটা ‘L’ আকারের হাতের মত সাজানো, নিচের ছবির মত (arm 1 এবং arm 2 দিয়ে পথদুটিকে দেখানো হয়েছে)।

একটা লেজার থেকে বেরনো রশ্মি পাঠানো হল এই বাহুদুটোর দিকে। প্রথমেই সেই আলো এসে পড়ল একটা বীম-স্প্লিটার (beam-splitter) এর উপর। বীম-স্প্লিটার আলোকে দুটো সমান ভাগে ভাগ করে দেয়। তারপর এই দুই অংশ ইন্টারফেরোমিটারের দুই বাহু বরাবর ছুটতে থাকে। ইন্টারফেরোমিটারের প্রতিটা বাহুর শেষ প্রান্তে রয়েছে একটা ভারী আয়না। সেখান থেকে ধাক্কা খেয়ে আলো ফিরে আসে বীম-স্প্লিটারে। তারপর বীম-স্প্লিটার পেরিয়ে এই আলোর কিছুটা অংশ আসে একটা আলো মাপার যন্ত্র (photodetector) বরাবর।

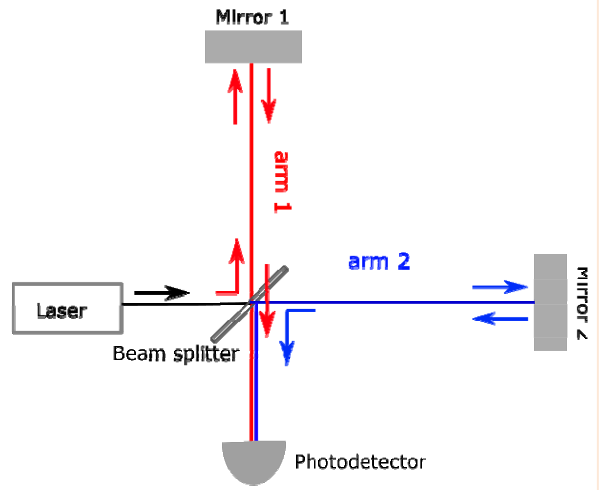

মাইকেলসন ইন্টারফেরোমিটারের মূল নকশা - লেজারের আলো একটা ‘বীমস্প্লিটারে-’ পড়ে দু’ ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই দুটি আলোক তরঙ্গ)লাল ও নীল রঙে দেখানো হয়েছে এখানে (দুটি প্রতিফলক থেকে ফিরে এসে আবার বীম স্প্লিটার হয়ে এসে পড়ে একটা আলোর তীব্রতা মাপার যন্ত্র বা ফোটোডিটেক্টরে। আলো যেহেতু তরঙ্গ, তাই ফোটোডিটেক্টরে মোট কতটা আলো এসে পড়বে, তা নির্ভর করবে লাল আর নীল রশ্মিদুটি দশার)phase) উপর। আবার এই তরঙ্গের দশা নির্ভর করে ঐ তরঙ্গ কতটা পথ পরিভ্রমন করল তার উপর। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এসে এই ইন্টারফেরোমিটারের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তাই ফোটোডিটেক্টরে কতটা আলো এসে পড়ল তাও পালটাতে পারে। এই নীতি অনুযায়ী কাজ করে লাইগো।

আলো যে একটা তরঙ্গ, সেটা ইন্টারফেরোমিটার বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পুকুরের উপর জলের তরঙ্গ যেমন উঁচু থেকে নীচু আবার উঁচু হয়ে এগিয়ে চলে, আলোর ক্ষেত্রেও ঘটনাটা একইরকম।

আলোক তরঙ্গ এগিয়ে চলে তার তড়িৎ ক্ষেত্র (আর চৌম্বক ক্ষেত্র) বাড়িয়ে কমিয়ে। দুটো তরঙ্গ একে অপরের ঘাড়ে চেপে তার তীব্রতা বাড়িয়ে দিতে পারে। আবার, নিজেদের মধ্যে কাটাকুটি করে তীব্রতা শূন্যও করে দিতে পারে। বোঝার জন্য পরের ছবিটা দেখা যেতে পারে ।

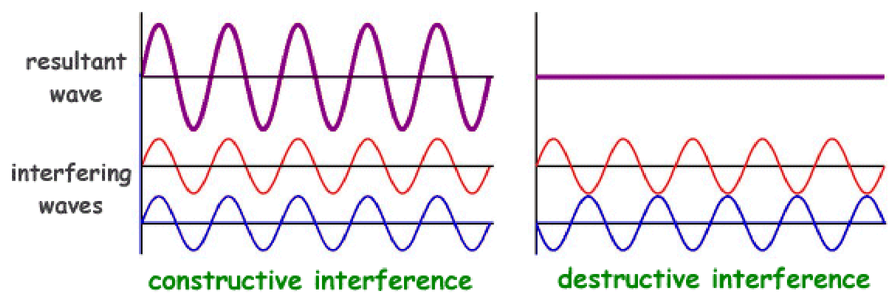

তরঙ্গের ইন্টারফেয়ারেন্স – একটা ঢেউ আরেকটার ঘাড়ে চাপলে হয় তেজ বেড়ে যায়, নয়তো কাটাকুটি হয়ে যায়।

বামদিকের ছবিতে, লাল আর নীল রঙের তরঙ্গদুটো একে অপরের সাথে ঠিক একই দশায় (phase) পড়েছে। তাই এই দুটো তরঙ্গ পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করে আরও বেশী বড় বা তীব্র হয়ে গেছে (উপরের গাঢ় বেগুনী রঙে এই দুই তরঙ্গের যোগফল দেখানো হয়েছে)।

ডানদিকের ছবিতে, লাল আর নীল রঙের তরঙ্গদুটো ঠিক উলটো দশায় একে অপরের উপর পড়েছে। তাদের যোগফল হল শূন্য।

দুটো তরঙ্গ একে অপরের ঘাড়ে চেপে তীব্রতা বাড়িয়ে দিতে পারে বা কাটাকুটি করে তীব্রতা শূন্যও করে দিতে পারে। আলোক তরঙ্গের এই ইন্টারফেরেন্সর মাধ্যমেই LIGO-তে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শনাক্তকরণ করা সম্ভব হয়।

এক্ষেত্রে আমরা ভাবতে পারি, আগের ছবির লাল রঙের তরঙ্গটা ইন্টারফেরোমিটারের প্রথম বাহু থেকে ঘুরে এসে ফোটোডিটেক্টরে পড়ছে, আর নীল রঙের তরঙ্গটা দ্বিতীয় বাহু ঘুরে এসেছে। LIGO-র ইন্টারফেরোমিটারে দুটো বাহুর দৈর্ঘ্য এমনভাবে নেওয়া হয় যাতে স্বাভাবিক অবস্থায় উপরের ডানদিকের ছবিটার মত হয়। অর্থাৎ, প্রথম বাহু থেকে ঘুরে আসা আলো (ছবিতে লাল রঙ) দ্বিতীয় বাহু থেকে ঘুরে আসা আলো (ছবিতে নীল রঙ) একে অপরের আলোক ক্ষেত্রকে কাটাকুটি করে দেয়। তাই, ফোটোডিটেক্টরে কোন আলো নেই।

এবার ধরা যাক একটা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এসে পড়লো এই LIGO ইন্টারফেরোমিটারে। এতে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য অন্যটার তুলনায় পালটে গেল (মহাকর্ষীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাহুদুটির থেকে অনেক বড়)। আলোক তরঙ্গের দশা অতিক্রান্ত দূরত্বের সাথে পালটাতে থাকে। তাই, নীল আর লাল তরঙ্গদুটোর দশা আগের তুলনায় (মানে যখন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ পড়েনি তখনকার তুলনায়) কিছুটা পালটে গিয়েছে। তারা আর পরস্পরকে বাতিল করে দেবে না। সেই কারণে ফোটোডিটেক্টরের উপর কিছুটা আলো এসে পড়বে। সেই আলোকে ফোটোডিটেক্টর ভোল্টেজে রূপান্তরিত করবে। সময়ের সাথে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের-ও দশা পালটাতে থাকবে, আর ইন্টারফেরোমিটারের এক বাহুর দৈর্ঘ্য

অপরের তুলনায় বাড়তে কমতে থাকবে। ফোটোডিটেক্টর একবার আলোয়, একবার আঁধারে পড়বে। মহাকর্ষীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্কেই ফোটোডিটেক্টরে তৈরি হওয়া ভোল্টেজ পালটাতে থাকবে। কত স্ট্রেন-এ কত ভোল্টেজ, তার একটা হিসেব থাকলেই হলো। এরপর ফোটোডিটেক্টরে-এর সিগনাল থেকে মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্ত করা যাবে। এইটেই হলো মহাকর্ষ তরঙ্গ ধরার ইন্টারফেরোমিটারের মূল নীতি।

উপরে যে ইন্টারফেরোমিটারের বর্ণনা দিলাম, এই ধরণের ইন্টারফেরোমিটারকে বলা হয় মাইকেলসন ইন্টারফেরোমিটার। ইন্টারফেরোমিটারের মূল ধারণা ঠিকভাবে বুঝলে পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারবেন যে এই ইন্টারফেরোমিটার দিয়ে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের থেকেও অনেকটা কম দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন মাপা সম্ভব।

কিন্তু, তাও যথেষ্ট না। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সত্যিই খুবই ক্ষীণ!

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ফলে ইন্টারফেরোমিটারের বাহুর দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের মান হবে সেই বাহুর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক। তাই LIGO-র ইন্টারফেরোমিটার বানানোর সময় বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করলেন বিশাল লম্বা হাত বানানোর। এতে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন বেশি হবে, তাই তা তুলনামূলকভাবে সহজে মাপা যাবে। তাঁরা ঠিক করলেন এক একটা হাতের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় চার কিলোমিটার! মহাকর্ষীয় তরঙ্গ স্থান-কালে যে strain তৈরি করে তা হল $১০^{-২১}$ এর মত। অর্থাৎ, এই চার কিলোমিটার দূরত্বের পরিবর্তন হবে একটা প্রোটোনের সাইজ বা ফেমটো-মিটারের ($১০^{-১৫}$ মিটার) এক শতাংশেরও কম। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এই দৈর্ঘ্যের থেকে অনেক বেশি – এক মাইক্রনের ($১০^{-৬}$ মিটার) কাছাকাছি।

তাহলে উপায়? ইন্টারফেরোমিটারের বাহুর দৈর্ঘ্য তো আর বাড়িয়ে কয়েক কোটি কিলোমিটার করা যাবে না পৃথিবীতে বসে। তাই বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন এই চার কিলোমিটার হাতের মধ্যেই আলোকে গোলকধাঁধায় ফেলা যাক। মানে, ইন্টারফেরোমিটারের আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে আলোক রশ্মি যখন ফিরে আসছে তাকে আলো ধরার যন্ত্র বা ফোটো-ডিটেক্টরে না পাঠিয়ে আবার ফেরত পাঠাও আয়নার দিকে। সে এভাবে ইন্টারফেরোমিটার থেকে বেরোনোর আগে বহুবার ঘুরতে থাকুক, যাতে তার অতিক্রান্ত পথ কেবল চার কিলোমিটার নয়, এর অনেক অনেক গুণ বেশি হয়। এতে দূরত্বের সূক্ষ্ম পরিবর্তন বিবর্ধিত (magnified) হবে।

এই গোলকধাঁধা তৈরি করা হয়েছে ইন্টারফেরোমিটারের প্রতিটা বাহুতে একটা করে অতিরিক্ত আয়না ঢুকিয়ে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই গোলকধাঁধাকে বলা হয় 'অপটিক্যাল ক্যাভিটি'। আয়নাদুটো প্রায় সব আলোকে প্রতিফলন করে দেয়, অর্থাৎ বাইরে থেকে ক্যাভিটিতে ঢোকা মুশকিল। কিন্তু একবার ঢুকে গেলেই ব্যাস! সেই আলো বনবন করে পাক খেতে থাকবে ক্যাভিটির মধ্যে। অবশেষে ক্যাভিটি থেকে যখন বেরোবে, তখন সে অতিক্রম করে ফেলেছে হাজার কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব। ইন্টারফেরোমিটারের অন্য বাহুতে আলোর যে অংশ ঢুকেছে তার হালও একই। নীচে, লাইগো ইন্টারফেরোমিটারের ছবির

নকশায় এই চার কিলোমিটারের দুটো 'অপটিক্যাল ক্যাভিটি' দেখা যাচ্ছে (ইন্টারফেরোমিটারের প্রতি বাহুতে রয়েছে দুটো করে 'Test mass' যা আলোর উত্তম প্রতিফলক (আয়না), তারা তৈরি করছে এক একটি ক্যাভিটি)।

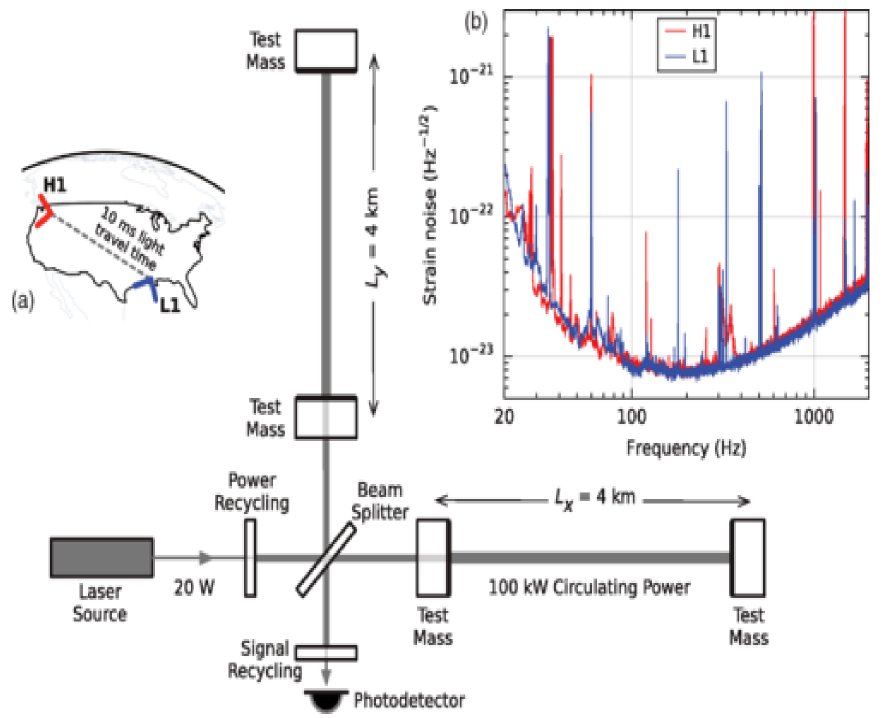

LIGO-র ইন্টারফেরোমিটারের গঠন। ইন্টারফেরোমিটারের Sensitivity বাড়ানোর জন্য প্রতি বাহুতে ব্যবহার করা হয়েছে 'অপটিক্যাল ক্যাভিটি'। (সূত্র: PRL* পেপার যেখানে মহাকর্ষ তরঙ্গ সনাক্তকরণের কথা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।)

*http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.116.061102

শুধু তাই নয়, লাইগোর ছবির দিকে তাকালে খেয়াল করবেন যে আরও দুটো ক্যাভিটি ব্যবহার করা হয়েছে দুটো অতিরিক্ত (আংশিক) প্রতিফলক ব্যবহার করে। ছবিতে এদুটোকে পাওয়ার রিসাইক্লিং (power recycling) আর সিগনাল রিসাইক্লিং (signal recycling) প্রতিফলক নাম দেওয়া হয়েছে। এদের কাজ হল ফোটোডিটেক্টরের উপরে পড়া সিগন্যালের মান বাড়ানো।

এত সব কাণ্ড করার দরুন লাইগো স্থান-কালের পরিবর্তন মাপতে এখনো অব্দি যত যন্ত্র তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে সবথেকে ক্ষমতাশালী। এই যন্ত্র তৈরী করতে অর্থ জোটানোর চেষ্টা বহু বছর আগে থেকে শুরু হয়েছে, সেই ১৯৮৪-৮৫ থেকে। এখন দুটো ইন্টারফেরোমিটার রয়েছে – দুটোই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। একটি আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমে ওয়াশিংটন রাজ্যের হ্যানফোর্ডে, আরেকটি দক্ষিণ পূর্বের লুইসিয়ানা রাজ্যের লিভিংস্টনে। লাইগো-র নকশা কয়েক বছর অন্তর অন্তরই পালটানো হচ্ছে, যাতে সেনসিটিভিটি (sensitivity) বাড়ে – আরও সূক্ষ্ম তরঙ্গ ধরতে পারে। বর্তমান প্রজন্মের নাম অ্যাডভান্সড লাইগো (Advanced LIGO), যা ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। লাইগো-র পিছনে এর মধ্যে খরচ হয়ে গিয়েছে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি)।

বহুবছর চেষ্টার পর গতবছরের সেপ্টেম্বর মাসে দুটো ডিটেক্টরেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরা পড়ল। যে মহাকর্ষ তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রায় একশো বছর আগে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তা ধরা দিল অবশেষে।

কিন্তু, বিজ্ঞানীরা জানলেন কি করে যে তাঁদের যন্ত্র কেঁপে উঠেছে মহাকর্ষীয় তরঙ্গেরই ফলে? এটাতো ছোটখাটো ভূমিকম্পও হতে পারে কিংবা হতেই পারে অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক নয়েজ।

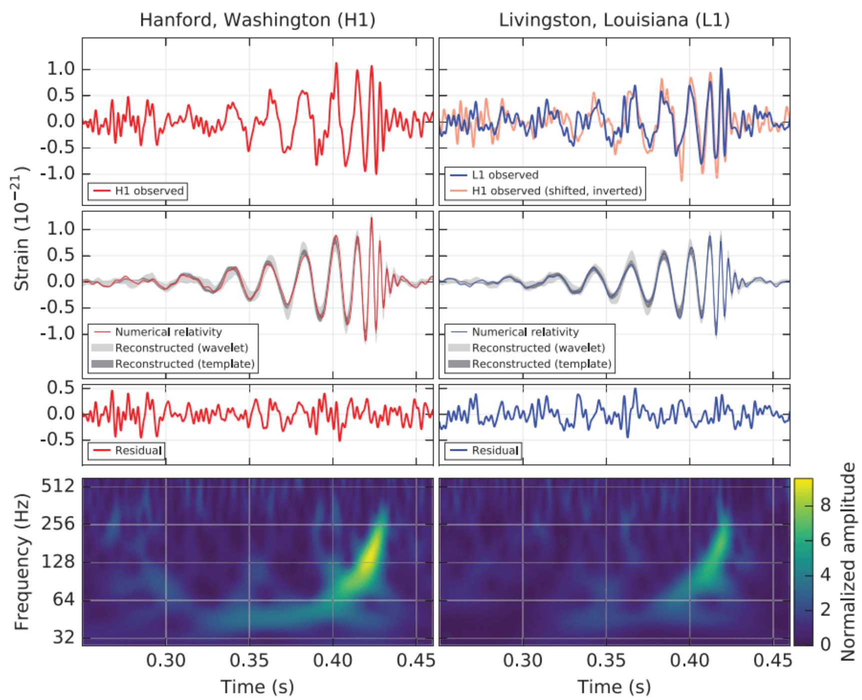

এই সেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে হাতেনাতে ধরার প্রথম ছবি! LIGO-র দুটি ইন্টারফেরোমিটারেই ধরা পড়ল মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সংকেত। সূত্র – PRL-এ প্রকাশিত মূল গবেষণা পত্র।

*http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.116.061102

|| পর্ব ৩: খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজা ||

২০১৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। লিভিংস্টনে স্থানীয় সময় তখন ভোর পাঁচটা একান্ন। হানফোর্ডের স্থানীয় সময় লিভিংস্টনের থেকে তিন ঘন্টা পিছিয়ে, সেখানে তখন রাত দুটো একান্ন। দুটো লাইগো-ই মুখিয়ে আছে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের 'শব্দ' শোনার জন্য। কখন যে সে তরঙ্গ আসবে তা তো কেউ জানে না, তাই সবসময় সতর্ক হয়ে থাকতে হয়। ফোটোডিটেক্টর, যেখানে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরা পড়বে ভোল্টেজ হয়ে, এতক্ষণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে।

হঠাৎ যন্ত্র জেগে উঠল ক্ষণিকের জন্য!

একটা সিগন্যাল ধরা পড়েছে। এবারে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী - সত্যিই কি প্রথমবার দেখা গেল এই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ? সেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ, যার উৎপত্তি মহাবিশ্বের সুদূর এক কোণে, হয়ত বা কয়েক কোটি বছর আগে।

> মহাকর্ষীয় তরঙ্গ LIGO যন্ত্রের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় কম্পনের সৃষ্টি করবে, যেটা মাপা যাবে একটা ফোটোডিটেক্টরে।

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরা কেন সোজা নয়

খাতায়-কলমে সোজা লাগছে বটে কিন্তু বাস্তবে অনেক ঝামেলা আছে। এমন নয় যে ফোটোডিটেক্টরের ভোল্টেজ কাঁপতে শুরু করলো মানেই একটা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এসে আঘাত করেছে। আমাদের পৃথিবীর বুকে হামেশাই ছোটখাটো ভূকম্পন হয়ে চলেছে এবং সেগুলো এতই দুর্বল যে আমরা টেরও পাই না। কিন্তু লাইগো তো চার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে একটা প্রোটনের ব্যাসের ভগ্নাংশ সমান পরিবর্তন হলেও ধরতে পারে: তাই তাকে এড়িয়ে যাবে কোথায়! এতই তার ক্ষমতা যে শ'য়ে শ'য়ে কিলোমিটার দূরে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়লেও সেটা ধরা পড়ে যায়। চারিদিকে এতরকম কম্পনের মাঝে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ খুঁজে পাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার।

> শ'য়ে শ'য়ে কিলোমিটার দূরে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়লেও সেটা ধরা পড়বে LIGO-তে।

অনবরত ভূকম্পন যাতে গবেষণায় অসুবিধার সৃষ্টি না করে, তাই লাইগো ইন্টারফেরোমিটার-টাকে চারপাশের ভূকম্পন থেকে বিচ্ছিন্ন করার সবরকম পথ অবলম্বন করা হয়েছে। লাইগোর ইন্টারফেরোমিটারের যে দুটো চোঙ্গা-মার্কা হাত, যার শেষে আছে দুটো আয়না, সেগুলোতে একদম আলট্রা-ভ্যাকুয়াম রাখা হয়েছে যা কিনা সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের এক ট্রিলিয়ন (এক লক্ষ কোটি) ভাগের এক ভাগ, এতে প্রায় বাতাস নেই বললেই চলে। এর ফলে লাভটা হলো, বাতাসের মাধ্যমে যে কম্পনগুলো আসতো, তাদের আটকে দেওয়া হলো। শুধু তাই না, বাতাসের মধ্যে লেসার রশ্মি গেলে সেটা গরম হয়ে যাবে, গরম বাতাসের ছুটন্ত অণু-ও সিগনালটা নষ্ট করে দিতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে, আমরা এখানে খুব ক্ষীণ একটা

সিগনালের কথা বলছি, যাকে ঘেঁটে দেওয়ার জন্য খুব বেশি কিছু লাগেনা।

লাইগোর প্রস্তুতির সময় ইন্টারফেরোমিটারের চোঙার গায়ে ধাক্কা খেল এক গাড়ী। (ছবি সৌজন্যে – নের্গিস মেভালওয়ালা, MIT)

লেসারের কথাই যখন উঠলো, সিগনাল ঘেঁটে দেওয়ার ব্যাপারে সে একাই যথেষ্ট। ওই যে রশ্মিটা গিয়ে আয়নাতে ধাক্কা খায়, তার চাপেই আয়না কিছুটা নড়ে যায়। এই ধাক্কাটা কিছুটা সামলানো যায় আয়নাটাকে ভারী বানিয়ে কিম্বা লেসার-এর পাওয়ার বা ক্ষমতা কমিয়ে। কিন্তু এতেই শেষ নয়, কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল নয়েজ বলে একটা ব্যাপার আছে, তার কথাও মাথায় রাখতে হয়। লেসারের আলোটা তো আসলে একগুচ্ছ কণা মিলিয়ে তৈরী। লেসারের শক্তি নির্দিষ্ট করে বেঁধে দিলেও, কতগুলো আলোককণা এসে প্রতিমুহূর্তে ফোটোডিটেক্টরে এসে পড়ছে, সেই সংখ্যাটা একদম স্থির নয়, কখনো একটু বেশি, কখনো একটু কম। এটাই Noise হিসাবে দেখা দেয়, যার ফলে ইন্টারফেরেন্সের আলো আর আঁধারের মধ্যে তফাতটা (interference contrast) আরো কমে যায়। আর এই আলো আঁধারের তফাত করতে পারার উপরেই গোটা পরীক্ষাটা দাঁড়িয়ে আছে!

এই যে এতরকম সমস্যা, সব কটারই কিছু না কিছু সমাধান বার করা হয়েছে। কয়েকটার কথা বললাম, সবের কথা বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। এবার আসল কথায় আসি , এতরকম গোলমালের মাঝে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ চেনা যায় কি করে।

অথৈ সমুদ্রে মণি খোঁজা

দুটো কৃষ্ণগহ্বর কাছাকাছি এসে একে অপরের চারিধারে ঘুরতে থাকলে যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের জন্ম হয়, তার আলাদা একটা বিশেষত্ব আছে। সময়ের সাথে সাথে তার প্রশস্ততা (amplitude) আর কম্পাঙ্ক (frequency) দুটোই বাড়তে থাকে। এর কারণটা বোঝা সহজ। কৃষ্ণগহ্বর দুটো যখন কাছাকাছি আসছে, তাদের কক্ষের ব্যাস কমতে থাকছে ফলে অনেক তাড়াতাড়ি এক একটা পাক সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারছে তারা। এর ফলে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্কও যাচ্ছে বেড়ে। সাথে সাথে তাদের গতিবেগও বাড়তে থাকে, যার ফলে তরঙ্গের প্রশস্ততার বৃদ্ধি হচ্ছে।

এই ধরণের সিগন্যালকে বলা হয় গ্র্যাভিটেশনাল-ওয়েভ চার্প (gravitational-wave chirp)।

আগেই বললাম, এই তরঙ্গ আমাদের ইন্টারফেরোমিটারে এসে পড়লে তার একটা হাত আরেকটার তুলনায় লম্বা হয়ে যায়। যার ফলশ্রুতি ইন্টারফেয়ারেন্স নকশার জায়গা বদল, আর ফোটোডিটেক্টরের মধ্যে ভোল্টেজ সৃষ্টি। ঠিক আগের অংশে আমরা দেখলাম, ফোটোডিটেক্টরের মধ্যে আরো হাজার একটা কারণে ভোল্টেজ সৃষ্টি হতে পারে। তাহলে আমরা বুঝবো কি করে যে, কোনটা মহাকর্ষীয় তরঙ্গের জন্য সৃষ্টি হচ্ছে?

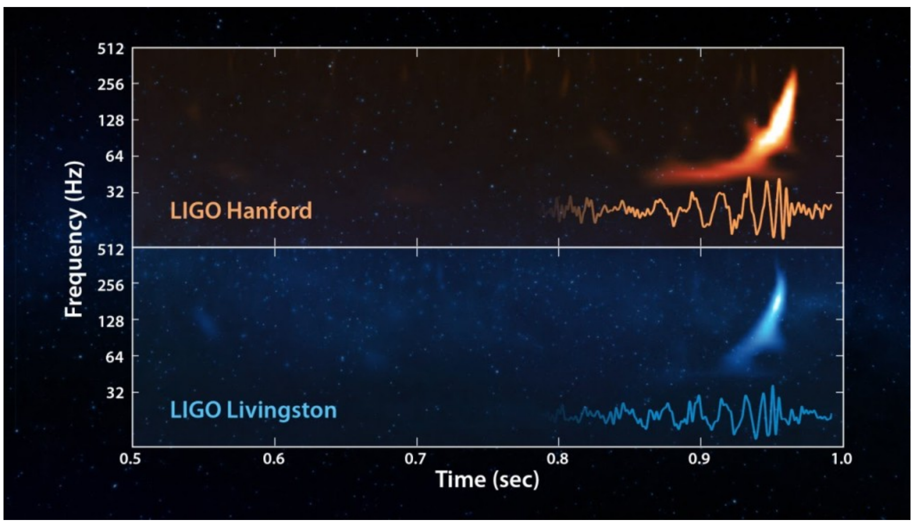

গ্র্যাভিটেশনাল-ওয়েভ চার্প ।

ছবির উৎস: https://i.ytimg.com/vi/TWqhUANNFXw/maxresdefault.jpg

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের চিহ্ন যেভাবে শনাক্ত করা হয়, সেটা বেশ চমকপ্রদ। ধরুন, আপনি একটা পার্টিতে গেছেন। চারিদিকে প্রচুর হইহট্টগোল, চেঁচামেচি, মাইকে জোরে গান চলছে। তার মধ্যেই আপনি দিব্যি এক বন্ধুর সাথে আড্ডা চালিয়ে যাচ্ছেন। বন্ধু বেশ মৃদুভাষী, তবু আপনার শুনতে অসুবিধে হচ্ছে না। এটা ঠিক কেন? কারণ আপনার মস্তিষ্ক তার গলার স্বরের সাথে খুব ভালোভাবে পরিচিত, তাই খুব সহজে সেই স্বরের চড়াই-উতরাই চিনে নিতে পারে। এই চেনা স্মৃতি ব্যবহার করে আপনার মস্তিষ্ক আর সকল শব্দের মধ্যে আপনার বন্ধুর স্বরকে অনায়াসে বেছে নিতে পারে।

একই জিনিষ একটা কম্পিউটারও পারে। তাকে শুধু বলে দিতে হবে কি ধরণের সিগন্যাল সে আশা করছে। এই পদ্ধতিটাকে বলে ম্যাচড ফিল্টারিং (matched-filtering)। কিন্তু জানবো কিভাবে কি ধরণের সিগন্যাল খুজছি? এখানেই আইনস্টাইনের সাধারণ অপেক্ষবাদ কাজে লাগে। দুটো কৃষ্ণগহ্বরের উপস্থিতিতে আইনস্টাইনের সমীকরণগুলোর সমাধান করা হয়, তারপর তার থেকে সিগন্যাল-এর ছাঁচ তৈরী করা হয়। ইন্টারফেরোমিটারে যত সিগন্যাল আসে, এই ছাঁচের সাহায্যে দেখা হয় সেটা প্রত্যাশিত মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সিগন্যালের মত দেখতে কিনা।

কিন্তু, আর বাকিসব কারণে যে সিগন্যাল সৃষ্টি হচ্ছে, তারা কি কেউই এই ছাঁচের সাথে মিলতে পারে না? অর্থাৎ, যন্ত্রটাকে কি টুপি পরানো সম্ভব নয়? যাতে 'টুপি পরার' সম্ভাবনা নামমাত্র হয়ে যায়, সেই জন্য একইরকম দুটো ইন্টারফেরোমিটার বানানো হয়েছে (একটা ওয়াশিংটন রাজ্যে আর একটা

লুইসিয়ানা রাজ্যে) এবং কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে বসানো হয়েছে। দু'জায়গাতেই একই ছাঁচের সিগন্যাল একই সময়ে পেলে, তবেই তাকে ধরা হয়, আরো চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্য।

অবশেষে দর্শন

১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫। দুটো ইন্টারফেরোমিটার - একটা হ্যানফোর্ড, ওয়াশিংটন-এ আর একটা লিভিংস্টন, লুইসিয়ানা-তে - দুজনেই একটা সিগন্যাল পেলো, যাতে স্পষ্ট মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ছাপ রয়েছে। সিগনাল দুটোর প্রাপ্তির সময়ের মধ্যে ৭ মিলিসেকেণ্ডের (অর্থাৎ এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের সাত ভাগ) তফাৎ। সিগনাল ৩৫ হার্টজ (Hz) থেকে শুরু হলো আর সিকি সেকেণ্ডের মধ্যে তার কম্পাঙ্ক বেড়ে ১৫০ হার্টজে গিয়ে ঠেকলো। এই কম্পাঙ্ক বৃদ্ধির রকমসকম থেকে অনুমান করা যায়, ১৩০ কোটি বছর আগে দুটো অতিকায় কৃষ্ণগহ্বরের সংঘর্ষ থেকে এই তরঙ্গ জন্মেছে। সংঘর্ষের আগে দুজনেই আলোর গতিবেগের অর্ধেক গতিবেগে ছুটছিলো।

আরো অঙ্ক কষে পাওয়া গেল, কৃষ্ণগহ্বর দুটোর ভর আমাদের সূর্যের ২৯ আর ৩৬ গুন বেশি। ওই যে সিকি সেকেণ্ডের জন্য তরঙ্গ ধরলাম আমরা, ওই সিকি সেকেণ্ডে তিনটে সূর্যের সমান ভর ধ্বংস হয়ে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের শক্তিতে পরিণত হয়েছে (আইনস্টাইন-এর আরেকটি সূত্র $E=mc^2$ মেনে)। এটা যে কতটা শক্তি, সেটা এইভাবে বোঝা যায়: এই শক্তিটাই যদি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ না হয়ে আলো হিসেবে বেরোতো, এর ঔজ্জ্বল্য মোটামুটি গোটা দৃষ্টিগোচর মহাবিশ্বের যাবতীয় তারা আর ছায়াপথের সম্মিলিত ঔজ্জ্বল্যকে ছাপিয়ে যেত, প্রায় ৫০ গুন বেশি। পৃথিবী থেকে প্রায় ১৩০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে সংঘর্ষটা ঘটেছে, অথচ আমরা সেটা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল দেখতে পেতাম।

লাইগোর প্রধান হোতাদের তিনজন – (বাঁদিক থেকে) রোনাল্ড ড্রেভার, কিপ থর্ণ, রাইনার ওয়াইস (ছবি – American Physical Society, Wikipedia)

দুই কৃষ্ণগহ্বর মিলে একটা নতুন কৃষ্ণগহ্বর তৈরী হলো, যেটার ভর ৬২-টা সূর্যের ভরের সমান। যতটা বেগে একটা কৃষ্ণগহ্বরের পক্ষে ঘুরপাক খাওয়া সম্ভব (অঙ্ক কষে একটা সীমা পাওয়া যায়), তার সত্তর শতাংশ বেগে ঘুরছে। শুধু মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রথম সনাক্তকরণ বলেই নয়, আরো অনেকগুলো কারণে ১৪ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাটি ঐতিহাসিক। কয়েকটা বলি:

১. প্রথম একটা কৃষ্ণগহ্বরের সরাসরি পরিচয় পাওয়া গেল, যেখানে চারিদিকের স্থানকালের উপর কৃষ্ণগহ্বরের প্রভাব স্পষ্ট।

২. আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মাধ্যমে যে ধরনের কৃষ্ণগহ্বরের কথা জানা যায়, বাস্তবেও ঠিক সেই রকমই দেখা গেল। যেহেতু একটা খুব শক্তিশালী মহাকর্ষ ক্ষেত্র এখানে জড়িত, বলা যেতে পারে সাধারণ অপেক্ষবাদের যথার্থতার আরো একটা প্রমাণ পাওয়া গেলো।

৩. দুটো কৃষ্ণগহ্বর যে যুগলবন্দী করে থাকতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। দুটো নক্ষত্রের যুগলবন্দী (binary star system) ভয়ানক সুপারনোভা বিস্ফোরণে খতম হয়ে গেলে যে দুটো কৃষ্ণগহ্বর জন্মায়, তারা তখনও যুগলবন্দীটা বজায় রাখতে পারে কিনা, সেটা জানা ছিল না।

৪. ঘূর্ণিরত কৃষ্ণগহ্বর দুটো যে এই মহাবিশ্বের জীবতকালে জোড়া লাগতে পারে, তারও প্রমাণ মিললো। যে দুটো নক্ষত্র থেকে এদের জন্ম, সে দুটো খুব কাছে থাকলে, একটা নক্ষত্র যখন রেড জায়ান্ট (red giant) অবস্থা দিয়ে সুপারনোভা বিস্ফোরণের দিকে এগোচ্ছে, সে অন্যটাকে গিলে ফেলতে পারে। তাতে কৃষ্ণগহ্বর হওয়ার আগেই নক্ষত্রদের যুগলবন্দীর সলিলসমাধি হয়ে যাবে। আবার অন্যদিকে, নক্ষত্রদুটো খুব দূরে থাকলে, তাদের কৃষ্ণগহ্বরদুটোও এত দূরে থাকবে যে কখনই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হবে না। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের যুগলবন্দীও আছে আর তাদের মধ্যে সংঘর্ষও হয়, এই দুইয়েরই প্রমাণ পাওয়া গেল।

এরপর কি?

মহাকর্ষ তরঙ্গের সনাক্তকরণের ফলে জ্যোতির্বিদ্যায় একটা নতুন দুয়ার খুলে গেছে। ডেভিড রাইটজে, লাইগো-র কার্যনির্বাহী পরিচালক বলেছেন, এই ঘটনাটি গ্যালিলিও-র টেলিস্কোপ মারফত প্রথম মহাবিশ্ব দেখার মতই গুরুত্বপূর্ণ। এখনো পর্যন্ত মহাবিশ্ব নিয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণা মানেই ছিল কোনো এক ধরণের টেলিস্কোপে ধরা আলো নিয়ে কারবার, তা সে দৃশ্যমান আলোই হোক কি ইনফ্রারেড, এক্স-রে, বেতার তরঙ্গ বা গামা তরঙ্গ। এবার আমরা মহাবিশ্বের সেই সব কোণাতেও উঁকি দিতে পারবো যেখান থেকে আলো আসে না।

এই বছরের দ্বিতীয়ার্ধে আরো একটা ইন্টারফেরোমিটার কাজ শুরু করবে, নাম তার ভারগো (Virgo)। এটা চালু হলে একটা বড়সড় সমস্যার সমাধান হবে। মহাকর্ষ তরঙ্গের উৎসটা ঠিক কোথায় অবস্থিত, সেটা নির্ণয় করতে অন্তত তিনটে সনাক্তকারী যন্ত্রের প্রয়োজন। এই তৃতীয়টা মাঠে নামলে আমরা মোটামুটি টেলিস্কোপ যা পারে, মহাকর্ষ তরঙ্গের সাহায্যেও তাই পারবো। আরো পরে, ২০১৮ নাগাদ, জাপানে কাগরা (Kagra) নামে একটা ইন্টারফেরোমিটার চালু হবে। বাড়বে বিশ্বব্যাপী ব্যবহার। ভারতও কাজ শুরু করে দিয়েছে, লাইগো-ইন্ডিয়া আসছে ২০২৩ নাগাদ। ভারতের যন্ত্রটা খুব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে, কারণ তার আগের যন্ত্রগুলো সব কাছাকাছি অক্ষাংশে

indigo

ভারতে বসতে চলেছে লাইগোর একটি ইন্টারফেরোমিটার। সেই উদ্যোগের লোগো, ওয়েবসাইট (http://www.gw-indigo.org/) থেকে।

(latitude)। আকাশের কোন কোণায় তরঙ্গের উৎস রয়েছে, সেটা ঠাওরাতে অন্য কোনো অক্ষাংশে একটা সনাক্তকারী যন্ত্র থাকা জরুরি, তাতে আরো সুক্ষ্মভাবে সেই উৎসের অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

এবার আমরা মহাবিশ্বের সেই সব কোণাতেও উঁকি দিতে পারবো যেখান থেকে আলো আসে না।

তারও পরে, ২০৩৪ নাগাদ, ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সী মহাকাশে একটা যন্ত্র বসাতে চায়, নাম eLISA (ইভলভড লেসার ইন্টারফেরোমিটার স্পেস এন্টেনা)। তিনটে কৃত্রিম উপগ্রহ, তারা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে। তবে তাদের পারস্পরিক দূরত্বটা এক রাখা হবে লেসার-রেঞ্জিংগের মাধ্যমে, যাতে তারা একটা সমবাহু ত্রিভুজ তৈরী করে। ধরা হচ্ছে, eLISA দাঁড়িয়ে গেলে মোটামুটি বেশিরভাগ ছায়াপথের ভিতেরই উঁকিঝুঁকি মারা সম্ভব হবে, তাদের কেন্দ্রের কৃষ্ণগহ্বর থেকে আসা তরঙ্গের মাধ্যমে।

হয়ত সৃষ্টির শুরু অর্থাৎ বিগ ব্যাং-এর সময়কারও চিহ্ন পাওয়া যাবে। এই মুহূর্তে বিগ ব্যাং সম্বন্ধে আমাদের যাবতীয় ধারণা আসে মহাবিশ্বের প্রথম আলো, কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন (বা সংক্ষেপে CMBR)-এর থেকে। তবে সেই আলো নির্গত হয়েছিল বিগ ব্যাং-এর ৪০০,০০০ বছর পরে। বিগ ব্যাং-এর ফলে জাত মহাকর্ষ তরঙ্গ মাত্র ১০-৩৫ সেকেন্ড পরের খবর এনে দিতে পারবে। হয়তো আমরা আরো ভালোভাবে জানতে পারবো কিভাবে সবকিছু শুরু হয়েছিল।

লেখক পরিচিতি:

শাওন ঘোষ ইতঃপূর্বে ওয়াশিংটন রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাকর্ষ তরঙ্গ সনাক্তকরণ নিয়ে কাজ করেছে। এই ফেব্রুয়ারী মাসে মহাকর্ষ তরঙ্গ নিয়ে যে গবেষণাটি হইচই ফেলে দিলো, তাতে শাওন অংশগ্রহণ করেছিল। এবং গবেষণাপত্রটির একজন লেখক-ও বটে। তার অনেক অবদানের মধ্যে একটা হলো, যেসব সূত্র থেকে ক্ষনস্থায়ী গামা রশ্মির বিস্ফোরণ (gamma ray burst) হয়, তাদের থেকে জাত মহাকর্ষ তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করা। বর্তমানে শাওন নেদারল্যান্ড-এর রাদবাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টডক্টরাল গবেষণায় রত।

কাজী রাজীবুল ইসলাম এম.আই.টি-হার্ভার্ড সেন্টার ফর আল্ট্রাকোল্ড অ্যাটমস-এর পোস্ট-ডকটরাল গবেষক। গবেষণার বিষয় – পরমশূন্য তামপাত্রার কাছে পদার্থের অবস্থা এবং কোয়ান্টাম ইনফরমেশন। এর আগে পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ এবং মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজীবুল http://bigyan.org.in ('বিজ্ঞান') এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2016/05/23/gravitational-wave-detection-ligo_1/

প্রচ্ছদের ছবি - LIGO ল্যাবরেটরীর
উৎস: http://www.pbs.org/

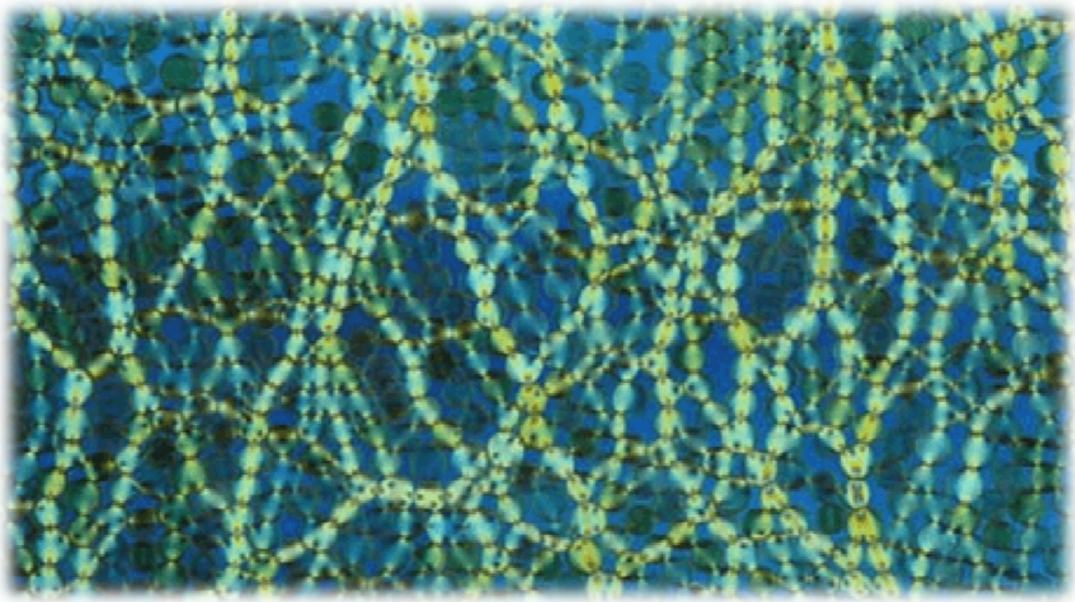

এলেবেলে বালি, বহমান বালি

সুমন্ত্র সরকার

বালিকে দেখে মনে হয় খুব এলেবেলে, সাধারণ জিনিস। কিন্তু এই সাধারণ দেখতে জিনিসটা হাজার হাজার বিজ্ঞানীকে বছরের পর বছর নাকাল করে রেখেছে।

একটু বুঝিয়ে বলি সমস্যাটা। ধর, তোমার হাতে একমুঠো বালি আছে। মুঠোটা প্রথমে খুব জোরে চেপে ধর। কেমন, চাপ লাগছে তো হাতে? একটা লোহার টুকরো মুঠোয় চেপে ধরলে একই রকম চাপ লাগবে। অর্থাৎ, চাপ দিলে বালি কঠিন পদার্থের মত আচরণ করে। এবার মুঠো খুলে হাতটাকে সামান্য কাত করে রাখো। বালিটা জলের মত ঝড়ে পড়বে। অর্থাৎ, চাপ তুলে নিলে বালি তরল পদার্থের মত ব্যবহার করে। সমস্যাটা এখানেই যে চাপ দেওয়া আর চাপ সরিয়ে নেওয়ার মধ্যে বালির আণবিক সজ্জার কোনো পরিবর্তন হয়না। তার মানে, তুমি যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে চেয়ে বসে থাকো, তাহলে এই কঠিন থেকে তরল হওয়ার ব্যাপারটা ধরতেই পারবে না।

বিজ্ঞানীরা পড়লেন মহা সমস্যায়। প্রায় একশো বছর ধরে তারা বলে আসছিলেন যে একমাত্র আণবিক সজ্জার পরিবর্তন হলেই পদার্থ তরল থেকে কঠিনে বা কঠিন থেকে তরলে বদলায়। পদার্থবিদরা শুরু করলেন এই ধাঁধার উত্তর খোঁজার। ইঞ্জিনিয়াররা অবশ্য অনেক আগে থেকেই এই সমস্যার সমাধান হিসেবে কিছু সূত্র দিচ্ছিলেন। তবে সেই সূত্রগুলো যাকে বলে ব্যবহারিক সূত্র বা এমপিরিকাল ল। এগুলো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পাওয়া। চাপ দিলে বালি কিভাবে আচরণ করবে, তা এই সূত্রগুলো মোটামুটি বলে দিতে পারে। কিন্তু

কেন এরকম আচরণ করে, তা বলতে পারে না। পদার্থবিদরা এই কেন-র উত্তর দিতে তৎপর হলেন।

তবে সে উত্তর পাওয়া খুবই কঠিন। প্রায় তিরিশ বছর ধরে অনেক সাধ্যসাধনা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শেষমেষ একটা আংশিক উত্তর পাওয়া গেল।

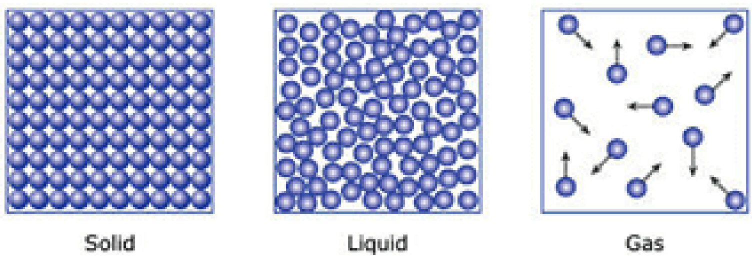

প্রায় গত একশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা ভাবছিলেন যে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয় কেবলমাত্র আণবিক গঠন সজ্জা পরিবর্তন হওয়ার ফলেই। যেমন এই ছবিটা দেখাচ্ছে।

সেই নিয়েই আজকের গল্প।

যেহেতু বালি কখনো কখনো জলের মত আচরণ করে, ভাবা হলো – একটা ট্যাঙ্কে যদি বালি ভরে ট্যাঙ্কের সাথে লাগানো একটা কল খুলে দি, তাহলে বালিটা জলের মত ঝড়ে পড়বে। কিন্তু দেখা গেল, ব্যাপারটা অতটা সোজা নয়। যদিও বালি মাঝেমাঝে অবলীলায় ঝড়ে পড়ে, কখনো কখনো সে কলের মুখে আটকেও যায়। বিজ্ঞানীরা পড়লেন মহা সমস্যায়। এরকম ঘটনা তো কখনো আগে দেখা যায়নি! ভেবে দেখো, কলের মুখ যত ছোট বা বড়ই হোক না কেন, জল কিন্তু কখনই আটকে যায়না।

এখন, বালির দানাগুলো খুব ছোটো আর এবড়ো-খেবড়ো। তাই বালি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে অসুবিধে হচ্ছিল নানারকম। ছোট বলে প্রত্যেকটা বালির দানাকে আলাদা করে দেখা যাচ্ছিল না। অথচ দানাগুলোর গতিপ্রকৃতি বুঝতে সেটা অত্যন্ত জরুরি। আবার এবড়ো-খেবড়ো বলে পরীক্ষার সময় দানাগুলোর আকারের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকছিল না। তাই সর্ষেদানা নিয়ে কাজ করা শুরু হলো। সর্ষেদানা আর বালির ধর্ম মোটামুটি একই রকমের। কিন্তু সর্ষেদানাগুলো মোটামুটি একই আকারের হয় আর সাইজেও বড়। শুধু সর্ষেদানাই নয়, চাল, ডাল, নুন, চিনি, রাস্তার ধুলো, ট্যালকম পাউডার, কাঁকর, এদের আর বালির ধর্মও এক। যেহেতু এরা সবাই ছোট্ট ছোট্ট দানা দিয়ে তৈরী (যেমন চালের দানা, ডালের দানা, চিনির দানা, নুনের দানা), এদেরকে বলা হয় দানাদার পদার্থ বা গ্র্যানুলার মেটেরিয়াল।

দানাদার পদার্থ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে সবথেকে সহজলভ্য বস্তু হল জল। আর তার পরের স্থানেই আছে দানাদার বস্তুগুলো।

সর্ষেদানা নিয়ে কাজ শুরু হল। সর্ষেদানাগুলোও কল থেকে বেরোনোর সময় আটকে যেতে থাকলো। এবং বিজ্ঞানীরা এবার সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। ওরা দানাদার পদার্থের প্রবাহের সাথে রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামে গাড়ি চলাচলের একটা মিল খুঁজে পেলেন। গাড়িগুলো যেমন এর ওর সাথে ধাক্কা খেতে খেতে কোনরকমে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়, সেরকমই সর্ষেদানাগুলোও এর ওর সাথে ধাক্কা খেতে খেতে কলের মধ্যে দিয়ে নামে। ধাক্কাধাক্কি করার ফলে ওদের শক্তি বাড়তে কমতে থাকে। মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয় যে ওদের আর ধাক্কাধাক্কি করার জায়গা থাকে না। পুরো স্রোতটাই বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম হলে যেমন হয় আর কি! বালি আর সর্ষের এই আটকে যাওয়ার নাম দেওয়া হলো জ্যামিং (Jamming)। মজার ব্যাপার হলো, বেশিরভাগ সময় যেমন একটা বা দুটো গাড়ির জন্য ট্রাফিক জ্যাম হয়, সেইরকমই চারটে বা পাঁচটা সর্ষেদানার জন্যেই পুরো স্রোতটা থেমে যায়। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! নিচের ছবিটা দেখো।

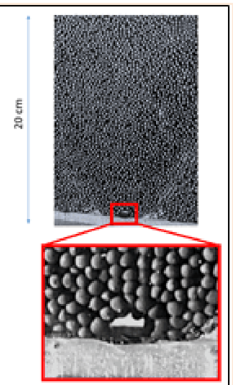

ট্রাফিক জ্যামে যেমন দু-তিনটে গাড়ি জ্যামটা লাগায়, তেমনি ছ-সাতটা সর্ষে দানা অর্ধবৃত্তাকার আকার গঠন করে দানাদার পদার্থের স্রোতটা আটকে দেয়।

কিন্তু কেন এমন হয়, তার উত্তর এখনো জানা নেই। এটুকু বোঝা গেলো যে জ্যামিং-এর ব্যাপার জানতে হলে শুধু দানাগুলোর অবস্থান জানলেই চলবে না। ওদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লেগে বল আর ভরবেগ কিভাবে দেওয়া নেওয়া হয়, সেটাও জানতে হবে। সমস্যা হলো, বল আর ভরবেগ তো চোখে দেখা যায়না। সেগুলোকে গণনা করে বার করতে হয়। তারও উপায় বেরিয়ে গেল। দেখা গেল যে বহমান বালির ভরবেগ আর বল মাপা কঠিন। কিন্তু একটা দুমুখো খোলা পাইপের মধ্যে দানাগুলোকে ঢুকিয়ে একটা স্তম্ভ তৈরী করলে তার একদম তলায় বল মাপা সোজা। পাইপের তলায় একটা কার্বন পেপার বসিয়ে দিলেই হলো। পেপারটার উপর দানাগুলোর চাপ পড়ে চাপের সমানুপাতিক একটা দাগ বসে যায়। আর স্তম্ভটাকে অল্প টোকা দিয়ে আবার ছাপ নেওয়া যায়। ওই ছাপগুলোকে কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে ওই পাইপের মধ্যে দানাগুলো কিভাবে বল আদান প্রদান করে, সেই গল্প জানা যায়। এই পরীক্ষা আর বিশ্লেষণটা খুব সহজেই করা যায়। পদ্ধতিটার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া হলো।

> দানাদার পদার্থে বলের আদান প্রদান খুব অদ্ভূত ভাবে হয়।

যে ধরনের তথ্য পাওয়া গেল, তাতে এটুকু বোঝা গেল যে, দানাদার পদার্থে বলের আদান প্রদান খুব অদ্ভূত ভাবে হয়। সাধারণত আমরা কোনো পদার্থের উপর বল প্রয়োগ করলে, সেই বলটা সমানভাবে বস্তুটার উপর ছড়িয়ে যায়। যেমন ধর আটার বলের উপর চাপ দিলে ওটা কেমন সমান ভাবে চেপ্টে যায়। কিন্তু দেখা গেল, দানাদার

পদার্থে বল প্রয়োগ করলে, সেটা সমান ভাবে ছড়ায় না। কোনদিকে বেশি বল চলে যায়, কোনদিকে আবার যায়ই না। কম্পিউটারে গণনার ফলে দেখা গেল যে বলগুলো নদীর মত নানা শাখায় (প্রচ্ছদের ছবিটার মত) এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। এর নাম দেওয়া হল বলশৃঙ্খল বা ফোর্স চেন। চেন, কারণ বল আদানপ্রদান মূলত একটা দিকেই হয়। আমার অবশ্য এটাকে নদীর ধারার মত দেখতে লাগে, তাই আমি বাংলায় একে বলধারা বলবো।

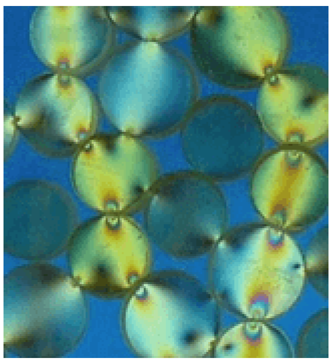

Photoelastic effect এর জন্য জিলেটিনের দানায় বল প্রয়োগ করলে, দানাগুলোর আলোকধর্মের পরিবর্তন হয়। এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে আমরা বলধারা বা ফোর্স চেন কে চাক্ষুষ দেখতে পারি। বলের মান যত বেশী, দানাগুলো তত উজ্জ্বল দেখায়।

সমস্যা হলো, খালি চোখে বলধারা দেখার কোনো উপায় ছিল না। তাই পরীক্ষা করে ঠিক-ভুল প্রমাণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু মুশকিল আসান করলো জিলেটিন। বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে বল প্রয়োগ করলে জিলেটিনের আলোকধর্মের বিশেষ পরিবর্তন হয়। একে বলে ফোটোইলাস্টিক এফেক্ট (Photoelastic effect)। জিলেটিনের দানার মধ্যে দিয়ে সমবর্তিত বা পোলারাইজড (Polarized) আলো পাঠালে, বলের প্রভাবটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় এবং বলের পরিমাণটাও মাপা যায়। সাধারণত, বল যত বেশি হয়, জিলেটিনের দানার ছবিটা তত উজ্জ্বল হয়।

যাইহোক, শেষমেষ বলকে চাক্ষুষ দেখার একটা উপায় বার হল। নানারকম পরীক্ষা করে দেখা গেলো, সত্যিই বলগুলো নদীর ধারার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সর্ষেদানার বদলে বিজ্ঞানীরা এই জিলেটিনের দানা নিয়ে

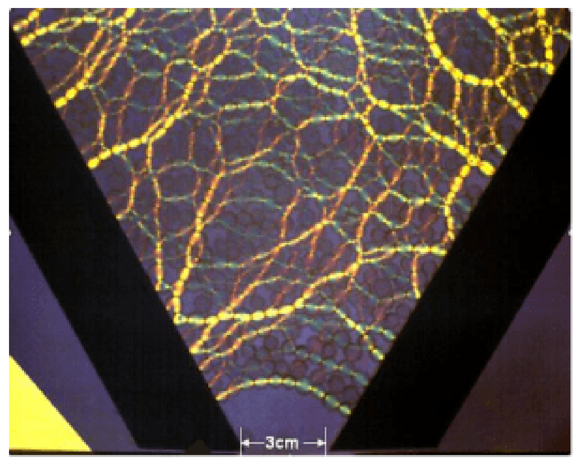

অল্প কয়েকটা (উপরের ছবিতে দশটা) জিলেটিনের দানা মিলে একটা খুব শক্তিশালী সেতু তৈরী করেছে। এই সেতু এত শক্তিশালী যে উপরের সবকটা দানার ভার সামলাতে পারে। এর ফলে দানাগুলোর স্রোতও বন্ধ হয়ে যায়।

আগের পরীক্ষাটি করলেন এবং দেখলেন কিভাবে মাত্র তিন চারটে দানা পুরো স্রোতটাকে আটকে দেয়। যেহেতু বলগুলো সাধারণত নদীর ধারার মত একদিক দিয়ে বয়ে যেতে পারে, কখনো কখনো অল্প কয়েকটা দানাতেই পাইপের এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে বলের আদান-প্রদান ঘটতে

পারে। বলের পরিমান খুব বেশি হলে উপরের দানাগুলো এই সেতু ভাঙ্গতে পারে না, আর স্রোতটাও বন্ধ হয়ে যায়।

এই জিলেটিনের দানাগুলো নিয়ে অনেক মজার মজার পরীক্ষা করা যায়। সেই পরীক্ষাগুলো থেকে জানা যায় কেন একমুঠো বালিতে চাপ দিলে, বালি কঠিন হয়ে যায় আর চাপ সরিয়ে নিলে বালি তরল পদার্থের মত আচরণ করে। সেই গল্প বলব পরের অংশে।

বালি মোটেই এলেবেলে বস্তু নয়। বরং, বালির ধর্ম এতটাই জটিল যে একশ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করার পরেও বিজ্ঞানীরা এখনো ভালোভাবে ওই ধর্মগুলোর ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। তরলের মত দানাদার পদার্থ-ও প্রবাহিত হতে পারে। একটা ট্যাঙ্কে বালি ভরে ট্যাঙ্কের সাথে লাগানো একটা কল খুলে দিলে বালি যেভাবে পড়ে। কিন্তু, বিভিন্ন পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে দানাদার পদার্থের প্রবাহ ঠিক তরলের মত নয়। খুব অল্প কয়েকটা দানাদার পদার্থ কিছু ক্ষেত্রে 'জ্যাম' লাগিয়ে এই প্রবাহ-স্রোতকে আটকে দিতে পারে। এই জ্যামিং-এর ফলে দানাদার পদার্থগুলো একসাথে (collectively) কঠিন পদার্থের মত ব্যবহার করে। একটু নাড়ালেই অবশ্য কয়েকটা দানা খসে যায়, আর দানাদার পদার্থের স্রোত আবার বইতে থাকে।

শুধুমাত্র দানাদার পদার্থেই জ্যামিং-এর ঘটনা সীমাবদ্ধ নয়। দৈনন্দিন জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই জ্যামিং দেখা যায়। যেমন, রাস্তায় একগাদা গাড়ি বেরোলে বা একগাদা জীবন্ত ব্যাকটেরিয়াকে একটা পেট্রি ডিশে রেখে দিলে, অনেক সময় ওরা ট্রাফিক জ্যাম লাগিয়ে দেয়। ইন্টারনেটের সার্ভারে একসাথে অনেক কানেকশন আসলে, ট্রাফিক জ্যাম লেগে সার্ভার বসে যায়। আবার ভাতের মাড় বা ওই ধরনের কলয়েড জাতীয় পদার্থের দ্রবণেও জ্যামিং দেখা যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ঘটনাটা মোটামুটি একই রকম ভাবে ঘটে থাকে: যখন দানাদার পদার্থগুলো একে অপরের সাথে বিশেষ ধাক্কাধাক্কি করে না, তখন স্রোতটা বজায় থাকে, আর যখন খুব ঠ্যালাঠেলি ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হয়, তখনই স্রোতটা জট পাকিয়ে গিয়ে একেবারে থেমে যায়, আর ট্রাফিক জ্যাম লেগে যায়।

জ্যামিং-এর অঙ্ক

যেহেতু অন্তর্নিহিত ঘটনাটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই, বিজ্ঞানীরা সমস্যাটার গাণিতিক সমাধান পেতে খুবই আগ্রহী হলেন। বাধ সাধলো সমস্যার জটিলতা। রাস্তায় যখন একগাদা গাড়ি চলে সেটা দেখতে সাধারণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু, তাকে গাণিতিক আকারে লেখা খুবই কঠিন।

মুশকিল আসান হল একমুঠো বালি দিয়ে। একমুঠো বালিকে হাতে রেখে হাতটা কাত করলে বালিগুলো জলের মত ঝরে পড়ে, আর হাতের মুঠোয় রেখে চাপ দিলেই কঠিন পদার্থের মত আচরণ করতে আরম্ভ করে। দেখা গেল, এই ব্যাপারটা জ্যামিং ছাড়া আর কিছুই নয়। আর একমুঠো বালির সুবিধা হল, তাকে ঠেলা না মারলে সে নড়ে না, অর্থাৎ এটি স্থির বস্তু। আর তোমরা যারা বলবিদ্যার অঙ্কগুলো করেছ, তারা তো জানোই চলমান বস্তুর তুলনায়

স্থির বস্তুর ব্যবহার গাণিতিক আকারে লেখা কত সোজা।

বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এই সমস্যার একটা খুব সুন্দর সমাধান দিলেন। ম্যাক্সওয়েল যুক্তি দিলেন যে, যেহেতু আমাদের হাতের একমুঠো বালিটা স্থির, তাই নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী, বালির উপরে মোট বলের পরিমান শূন্য হতে হবে। এখন বালি, বিশেষত শুকনো বালি, হচ্ছে এমন একটা পদার্থ, যে দুটো বালির দানা একে অপরের গায়ে লাগালাগি করে না থাকলে বলের আদান প্রদান করতে পারে না। ভেবে দ্যাখো এই ব্যাপারটা কিন্তু গাড়ি বা ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও সত্যি। দুটো গাড়ি একে অপরের উপর এসে পড়লে তবেই পরস্পরের উপর বলপ্রয়োগ করে। তেমনই, দুটো ইন্টারনেটের কানেকশন একই সার্ভারে একসাথে না পৌঁছালে সার্ভার বসে যায় না।

ম্যাক্সওয়েল দেখালেন যে একটা বালির দানার গায়ে গা ঠেকিয়ে যখন অনেক দানা বসে থাকে তখন এই জ্যাম লাগার ঘটনা ঘটতে পারে।

এই ‘অনেক’ মানে কত?

এবড়ো-খেবড়ো চেহারার বালির জন্য এই সংখ্যাটা হিসেব করা শক্ত। কিন্তু বালিগুলো যদি নিটোল গোলাকার হয়, মানে ঝকমকে পিং পং বলের মত, আর বালিগুলোর মধ্যে যদি কোনো ঘর্ষণ বল না থাকে, তাহলে অঙ্কটা কষা সহজ। দেখা যায়, প্রত্যেক কণার গায়ে ঠেকে থাকা অন্য কণার সংখ্যা - যার আরেক নাম হল প্রথম কণার কো-অর্ডিনেশন সংখ্যা - যদি গড়ে ছ’য়ের বেশি হয়, তাহলে জ্যাম লেগে যেতে পারে। বালি বা পিং পং বলের বদলে দুই মাত্রায়ও জ্যামিং দেখা যেতে পারে। যেমন ক্যারম বোর্ডের উপর। সেখানে ক্যারম গুটির কো-অর্ডিনেশন সংখ্যা গড়ে চার বা তার বেশি হলেই জ্যাম! আর কো-অর্ডিনেশন সংখ্যা এর থেকে কম হলে বালি আর অন্যান্য দানাদার পদার্থগুলো তরল পদার্থের মত ব্যবহার করে।

কিন্তু কেন এমন হয়?

একমুঠো বালিতে চাপ দিলে কি হয় সেটা বোঝার জন্য মনে কর, তোমার হাতের মুঠোটা একটা চৌকো বাক্সের মত। যখন হাতের মুঠোতে চাপ দিচ্ছ, তখন বাক্সটা শুধু আয়তনে ছোট হয়ে যায় তাই নয়, খানিকটা এঁকেবেঁকেও যায়। আর এই দুটো কারণেই একমুঠো বালিতে জ্যাম লেগে যেতে পারে।

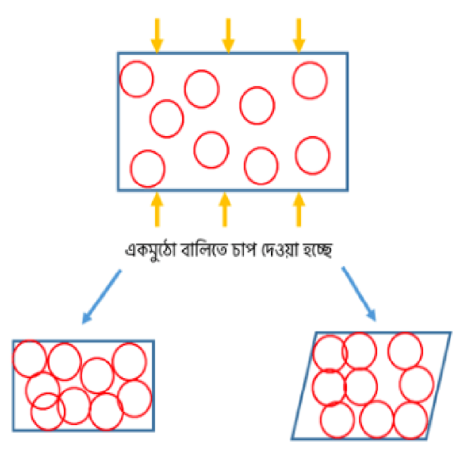

চাপ দেওয়ার ফলে বাক্সের আয়তন কমে যায় বা বাক্সটা বেঁকে যায় বা দুটোই ঘটে। তিনিটে ক্ষেত্রেই দানাদার পদার্থে জ্যাম লেগে যায়।

বাক্স আয়তনে ছোট হয়ে গেলে কেন বালিতে জ্যাম লাগে, সেটা বোঝা তুলনামূলক ভাবে সোজা। বাক্স আয়তনে ছোট হয়ে গেলে, বালির দানাগুলোর আর

নড়াচড়ার কোনো জায়গা থাকে না, তাই ওদের আর গায়ে লাগালাগি করে থাকা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না; হাইওয়ে থেকে ছোট রাস্তায় একসাথে অনেক কটা গাড়ি ঢুকলে যেমনটা হয় আর কি। আর গায়ে লাগালাগি করতে হলেই হু হু করে ওদের কো-অর্ডিনেশন সংখ্যা বাড়তে বাড়তে জ্যাম লেগে যায় আর ওরা কঠিন পদার্থের মত আচরণ করতে থাকে।

বাক্সটা বেঁকে গেলে কেন জ্যামিং হয় সেটা বুঝতে গিয়ে কিন্তু বিজ্ঞানীরা ঘোল খেয়ে গেলেন। কেউ কেউ বললেন যে বাক্সটা বেঁকে যাওয়ার কারণে ওর আয়তনেরও পরিবর্তন হচ্ছে, তাই জ্যামিং হচ্ছে। এই ধারণাটা সত্যি না মিথ্যে যাচাই করতে বিজ্ঞানীরা খুব সূক্ষ্ম একটা পরীক্ষা করলেন, যাতে চাপ দেওয়ার ফলে বাক্সটা বাঁকতে থাকলেও ওর আয়তনের কোনো পরিবর্তন হল না। আর বাক্সের আয়তন এমন ভাবে বাছা হল, যাতে না বাঁকা অবস্থায় বাক্সের ভিতরের দানাদার পদার্থগুলো তরল পদার্থের মত ব্যবহার করে। এখন যদি তাত্ত্বিক ধারণাটা সঠিক হয়, তাহলে বাক্সটাকে যতই বাঁকাই না কেন, কোনমতেই দানাদার পদার্থগুলোতে জ্যাম লাগবে না। কিন্তু, তত্ত্বকে নস্যাৎ করে পরীক্ষাটা দেখালো যে একটুক্ষণ বাঁকানোর পরেই দানাদার পদার্থগুলোতে জ্যাম লেগে যাচ্ছে আর ওরা কঠিন পদার্থের মত আচরণ করতে আরম্ভ করছে।

আশার ব্যাপার হল এই পরীক্ষাটা করা হয়েছিল একটা বিশেষ ধরনের দানাদার পদার্থ নিয়ে, যারা গায়ে গায়ে লেগে গিয়ে বলের আদান-প্রদান করলে একটা বিশেষ উপায়ে ওই বলগুলোকে দেখা যায়। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে এটা একটা বিরাট আবিষ্কার। একটা তুলনা দিলে এর অসাধারণত্বটা বুঝতে পারবে। ধর, আমাদের দেহ-কোষে প্রোটিন-এর একটি লম্বা অণু আশেপাশের জলের অণুর ধাক্কায় কিভাবে ভাঁজ খেয়ে যায়, তা জানতে চাইছ (এই লেখাটা দেখ)। এখন তুমি যদি প্রোটিনের প্রত্যেকটা অণু-পরমাণুর সাজ-সজ্জা দেখতে পেতে, আর একটা প্রোটিন জলের অণুগুলো বা অন্য প্রোটিনগুলো-র সাথে কিভাবে ধাক্কাধাক্কি করছে সেটা চোখে দেখতে পেতে, তাহলে কি দারুন

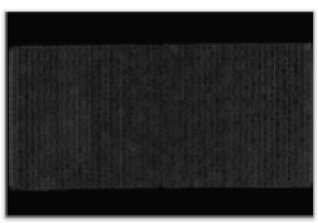

পরীক্ষার শুরুতে কোনো বলের আদান-
তাই কোনো বলধারাও ,প্রদান ঘটে না
দেখা যায় না।

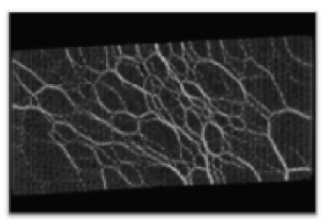

জ্যামিং –এর আগের মুহূর্তে বলের
আদানপ্রদান হয় নদীর ধারার মত -
শাখা প্রশাখায়। উপরের ছবিতে সাদা
অংশ গুলো বলগুলোকে দেখাচ্ছে।

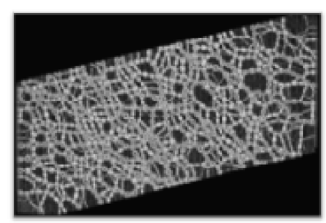

জ্যামিং –এর বেশ কিছু পরে
বলগুলো চারিদিকে সমান ভাবে
ছড়িয়ে পড়ে। তাই নদীর শাখা
প্রশাখার মত বলধারাগুলোকে
আলাদা করে আর চেনা যায় না।

দানাদার পদার্থ ভরা বাক্সটাকে যত বাঁকানো হয় দানাদার ,পদার্থগুলো তত একে অপরের গায়ে লাগালাগি করতে করতে জ্যাম লাগিয়ে দেয়। মজার ব্যাপার হল বাক্সটাকে ,বাঁকানো হলেও ওর আয়তনের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাইএই ক্ষেত্রে জ্যামিং কিভাবে হয় ,তা বুঝতে বিজ্ঞানীরা হিমসিম খেয়ে গেছিলেন।

ব্যাপারটাই না হত। তুমি প্রোটিনগুলোর আচার আচরণ দেখে, আর অঙ্ক কষে বলে দিতে পারতে যে প্রোটিনটা জট পাকিয়ে কোন অবস্থায় শেষমেষ পৌঁছতে পারে। দানাদার পদার্থগুলো নিয়ে এই পরীক্ষাটাতে ঠিক এইটাই করা হয়েছে। যেহেতু আমরা প্রত্যেকটা বলের আদান-প্রদানকে দেখতে পাই, তাই কিছু অঙ্ক কষে আর ছবি এঁকেই আমরা দানাদার পদার্থগুলো সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি।

দানাদার পদার্থের ওই ছবিগুলোতে দেখা গেল বাক্সটা যত বাঁকতে থাকছে, দানাগুলো ততই একে অপরের সাথে ধাক্কাধাক্কি করছে। গায়ে গায়ে লেগে গিয়ে কো-অর্ডিনেশন সংখ্যাটাও বাড়াচ্ছে। কিন্তু আয়তনের তো কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, তাহলে কো-অর্ডিনেশন সংখ্যাটা বাড়ছে কিভাবে?

সমাধান পায়ের তলার বালিতে

বেশ কিছুদিন খোঁজখবর করার পর উত্তর পাওয়া গেল ম্যাক্সওয়েলের সমসাময়িক আরেকজন বিজ্ঞানীর কাছ থেকে। অসবোর্ন রেনল্ডস (Osborne Reynolds) নামে একজন বিজ্ঞানী দেখালেন যে একগাদা এবড়ো-খেবড়ো দানাদার পদার্থকে একটা বাক্সে রেখে বাক্সটাকে যদি বাঁকানো হয়, তাহলে ঘর্ষণের জন্য নীচের ছবির মত একটা দানা অন্য আরেকটা দানার গা বেয়ে বেয়ে উঠতে থাকে। এই গা বেয়ে বেয়ে ওঠার ফলে দানাগুলো অনেক বেশি জায়গা জুড়ে থাকতে বাধ্য হয়। এই ঘটনাটাকে বলে রেনল্ডস স্ফীতি (Reynolds' Dilatancy)।

সমুদ্র সৈকতে এই ঘটনাটা সবসময় দেখা যায়। পরের বার যখন তুমি ভিজে বালির উপর দিয়ে হেঁটে যাবে, লক্ষ্য করে দেখবে যে তোমার পায়ের আসেপাশে বালিগুলো শুকনো হয়ে যাচ্ছে। এটা ঘটে রেনল্ডস স্ফীতির জন্যই। যখন তুমি বালির উপর দিয়ে হেঁটে যাও তখন তোমার পায়ের চাপে তোমার পায়ের তলায় বালির যে স্তর থাকে, সেটা খানিক বেঁকে যায়। আর সমুদ্র সৈকতের বালি তো এবড়ো-খেবড়ো, তাই রেনল্ডস স্ফীতির জন্য তারা আর গায়ে লাগালাগি করে থাকতে পারে না (ছবি দেখ)। তার ফলে দু-তিনটে বালির দানার মাঝে লুকিয়ে থাকা জল বেরিয়ে যায় আর বালিটাকেও শুকনো দেখতে লাগে।

বালির দানাকে একটা বাক্সে রেখে বাক্সটাকে বাঁকালে, ঘর্ষণ বলের জন্য দানাগুলো একে অপরের গা বেয়ে উঠতে থাকে।

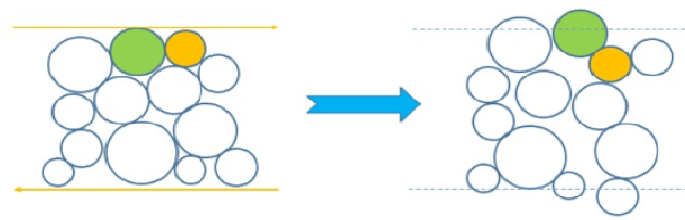

দানাগুলো একে অপরের গায়ে উঠে যাওয়ার জন্য দানাগুলো অনেক বেশি জায়গা জুড়ে থাকতে বাধ্য হয়। একে রেনল্ডস স্ফীতি বলে।

এবার ফিরে আসি দানাদার পদার্থটা নিয়ে পরীক্ষার কথায়। আগেই বলেছি পরীক্ষাটা এমন একটা বাক্স

নিয়ে করা হয়েছিল, যেটাকে বাঁকানো যায়, কিন্তু কোনভাবেই তার আয়তন বাড়ানো যায় না। পরীক্ষাটা করার জন্য বাক্সটাকে ক্যারাম গুটির মত দেখতে দানাদার পদার্থ দিয়ে এমন ভাবে ভরা হল যে বাক্স না বাঁকালে দানাদার পদার্থগুলো তরল পদার্থের মত ব্যবহার করে। তারপর পরীক্ষা করার জন্য বাক্সটাকে আস্তে আস্তে বাঁকাতে শুরু করলাম।

অসবোর্ন রেনল্ডস

রেনল্ডস স্ফীতি

এই দানাদার পদার্থটা আবার বালির মতই এবড়ো-খেবড়ো। তাই বাক্সটাকে যতই বাঁকানো হয়, দানাদার পদার্থগুলো আরও বেশি জায়গা জুড়ে থাকতে চায় রেনল্ডস স্ফীতির জন্য। কিন্তু এ বাক্স তো আবার যে সে বাক্স নয়, এর তো আয়তনই বাড়ে না। এ তো পড়া গেল মহা সমস্যায়। দানাদার পদার্থ চায় বাড়তে আর বাক্স বলে বাড়বো না। তাহলে কি উপায়? দানাদার পদার্থ আর বাক্সের এই ঝগড়াঝাঁটি মিটল খুব মজাদার উপায়ে।

ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা লোকাল ট্রেনের ভিড়ের মত। যখন খুব ভিড় হয়, লোকজন চায় একটু এদিক ওদিকে সরে দাঁড়াতে, যাতে গায়ে লাগালাগি করে থাকতে না হয়। কিন্তু যতক্ষণ ট্রেন চলে, ততক্ষণ তো আর সরে দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না, তাই বাধ্য হয়ে সবাইকে গাদাগাদি করে এর ওর গায়ে গা লাগিয়ে থাকতে হয়। আমাদের পরীক্ষার ওই দানাগুলোও ঠিক এক জিনিস করে। বাক্সটার ভিতরে ওরাও গাদাগাদি করে এর-ওর গায়ে গা লাগিয়ে থাকতে বাধ্য হয়। আর এর ফলে ওদের কো-অর্ডিনেশন সংখ্যাও বাড়তে থাকে। শেষ-মেষ কো-অর্ডিনেশন সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে জ্যাম লাগানো ছাড়া ওদের আর উপায় থাকে না।

দানাদার পদার্থগুলোর কো-অর্ডিনেশন সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই ওরা জ্যাম লাগিয়ে দেবে।

যাইহোক, বালি, সর্ষে, আর গুচ্ছের যত দানাদার পদার্থ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল যে যদি কোনো ভাবে দানাদার পদার্থগুলোর কো-অর্ডিনেশন সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই ওরা জ্যাম লাগিয়ে দেবে। তবে দানাদার পদার্থগুলো আরও অনেক ধরনের অদ্ভুত ঘটনা ঘটায়, যেগুলো এখনো আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। যেমন ধর, ভূমিকম্প, তুষারধ্বস (avalanche) এই সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী দানাদার পদার্থগুলো। কিন্তু, আমরা এখনো জানি না কোথায় কখন ভূমিকম্প হবে বা কোন পাহাড়ে ধ্বস নামবে। আর এগুলো জানতে গেলে দানাদার পদার্থের ব্যবহারকে আরও গভীর ভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে।

চেষ্টা করে দেখবে নাকি তোমরা?

উৎসাহী বন্ধুদের জন্য রইল এই বলধারা নিয়ে মজা করার উপযোগী কিছু প্রশ্ন আর নির্দেশিকা। স্কুল কলেজের মাষ্টারমশাইরা এগুলোর সাহায্যে একটা মজাদার প্রোজেক্টও করাতে পারেন কয়েকজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে।

দানাদার পদার্থের স্তম্ভ

মূল আলোচনায় আমরা দানাদার পদার্থের স্তম্ভের ব্যাপারে কথা বলেছি। বিজ্ঞানীরা বুদ্ধি লাগিয়ে খুব সহজ উপায়ে এই স্তম্ভের তলায় বলের পরিমান মেপেছিলেন। তোমরাও খুব সহজে বাড়িতে বসে এই পরীক্ষাটা করতে পারো। আর তোমাদের কাছে কম্পিউটার থাকলে এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটাও করতে পারো। নীচে আমি পদ্ধতির একটা খসড়া দিলাম, কয়েকজন বন্ধু মিলে পরীক্ষাটা করে ফেলো আর আমাদের জানাও তোমাদের পরীক্ষার ফলাফল।

পরীক্ষা

উপকরণ:

১. দানাদার পদার্থ: সাইজে একটু বড় হলে ভালো হয়। বল বেয়ারিং বা কাঁচের গুলি ব্যবহার করলে সবথেকে ভালো হয়। সর্ষে ব্যবহার করলে কার্বন পেপারের ছাপগুলো বুঝতে অসুবিধা হবে।

২. দুমুখ খোলা চোঙ (সিলিন্ডার): কোল্ডড্রিঙ্কসের বোতল কেটে নিজে বানাতে পারো অথবা PVC পাইপ কেটে কেটে বানাতে পারো। পাঁচ-ছয়টা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সিলিন্ডার হলে ভালো হয়।

৩. কার্বন পেপার আর সাদা কাগজ, যাতে কার্বন পেপারটার ছাপ পড়বে।

৪. স্ক্যানার বা ডিজিটাল ক্যামেরা।

৫. Matlab বা ওই জাতীয় প্রোগ্রামযাতে পরীক্ষাটার বিশ্লেষণ করা যায়।

পদ্ধতি:

১. দানাদার পদার্থ দিয়ে একটি চোঙ পুরো ভর্তি করো।

২. এবার সাবধানে চোঙটাকে কার্বন পেপার আর সাদা কাগজের উপর রাখো।

৩. হালকা হালকা করে টোকা মারতে থাক। দেখবে দানাদার পদার্থগুলো এদিক ওদিক সরে যাচ্ছে। কৌটোতে বিস্কুট বা মুড়ি ঢোকানোর সময় আমরা যেমন ঠুকে ঠুকে বা থাবরা মেরে জায়গা করি অনেকটা সেইরকমই, কিন্তু আস্তে আস্তে কর,যাতে দানাদার পদার্থগুলো না লাফায়। মোটামুটি এক-দু মিনিট ধরে টোকা মারো, যাতে দানাদার পদার্থগুলো সরা বন্ধ হয়। এই পদ্ধতিকে বলে compaction (কমপ্যাকসান)। বড় বড় বাড়ির ভিত বানানোর সময় এরকম করা হয়, যাতে তলার মাটি পরবর্তীকালে সরে গিয়ে দুর্ঘটনা না ঘটায় ।

৪. এবার দানাদার পদার্থগুলোর উপরে ভারী একটা পদার্থ বসিয়ে দাও (৫ বা ১০ কেজির বাটখারা বসালে ভালো হয়)।

৫. দ্যাখো কোনো দাগ পড়ল কিনা। যদি না পড়ে, আরও ভারী ওজন নিয়ে দেখতে পারো।

৬. এই অবস্থায় দশ-পনের বার করে পরীক্ষাটা কর, যাতে যথেষ্ট পরিমানে data পাওয়া যায়। খেয়াল রেখো যাতে চোঙটা না নড়ে। প্রত্যেক পরীক্ষার জন্য আলাদা আলাদা সাদা কাগজ ব্যবহার কর।

৭. আবার নতুন করে চোঙটা ভর আর পরীক্ষাটা কর। কিছু আলাদা দেখতে পেলে কি?

বিশ্লেষণ:

১. সাদা কাগজগুলো স্ক্যান কর।

২. এবার matlab ব্যবহার করে সাদা কাগজের উপর দাগগুলোর বিশ্লেষণ কর। এই পদ্ধতিকে বলে image processing (ইমেজ প্রসেসিং)।

৩. দাগ যত বেশি, বলের পরিমান তত বেশি। কোনো একটা দাগের মাপকে একক পরিমান বল হিসেবে ধর। এই এককের উপর ভিত্তি করে বাকি বল গুলোর পরিমাপ কর।

৪. এবার বলগুলোর probability distribution (প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন) বের কর। কি দেখলে?

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আমরা এবার একটা সহজ তত্ত্বের দ্বারা উপরের পরীক্ষাটা বোঝার চেষ্টা করবো। এই ধরনের তত্ত্বকে ইংরেজিতে বলে Toy Model (টয় মডেল)। আমি এখন যে তত্ত্বের কথা বলব, তাকে বলে q-model। আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে এই মডেলটা বেরোয়। পেপারটা এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারো। আজ প্রায় বছর কুড়ি পরে আমরা আবার এই মডেলটা নিয়ে খেলা করব।

উপকরণ:

Matlab বা ওই জাতীয় প্রোগ্রাম যাতে পরীক্ষাটার বিশ্লেষণ করা যায়।

পদ্ধতি:

১. Triangular lattice-এ (নীচের ছবি) বেশ কয়েকটা দানাকে সাজাও। প্রত্যেকটা সারিতে মোটামুটি এক-দুহাজার করে দানা রাখো। এরকম করে বেশ কয়েকটা (১০০-২০০ যেমন ইচ্ছা) সারি বানাও।

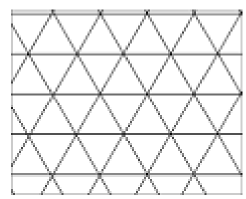

২. শেষ হলে, বিভিন্ন সারিতে বলের probability distribution (প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন) মাপো। কি দেখতে পেলে?

৩. প্রত্যেক দানার ওজন w আর r নম্বর সারির i নম্বর দানার উপর মোট বলের পরিমান F(r,i)।

৪. প্রত্যেক দানা তার নীচের সারিতে সবথেকে নিকটবর্তী দানাদুটিতে এই F(r,i) আর নিজের ওজন পুরোপুরি বিতরণ করে দেয়। কিন্তু দানা দুটির মধ্যে বিতরণের পরিমান আলাদা আলাদা হতে পারে। ধরা যাক, একটা দানা এই বলের q অংশ পেলো, তাহলে অন্য দানাটা 1 - q অংশ পাবে। কোন দানা কোন অংশ পাবে, সেটা কিন্তু পুরো random বা এলোমেলো। তাই একটা কয়েন টস (কম্পিউটারে) করে ঠিক করা যায় কোন দানা

কোন অংশটা পাবে। তাহলে একটা দানার উপর বলের পরিমান হলো q*(F+w) আর অন্য দানার উপর বলের পরিমান হলো (1-q)*(F+w)। এই q হলো model-টার একটা parameter। তাই একে q-model বলে।

৫. এইভাবে বলের আদান প্রদান করতে থাকো।

৬. দানায় বলের পরিমান একটা রং দিয়ে দেখাও। দেখবে বলধারার মত আকার দেখতে পাবে। দ্যাখো তো পরীক্ষার সাথে মেলে কিনা!

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2015/07/13/elusive-sand/

লেখক পরিচিতি:

সুমন্ত্র সরকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে পোস্ট-ডকটরাল গবেষক। গবেষণার বিষয় - সেল্ফ রেপ্লিকেটিং পদার্থদের ফিজিক্স। এর আগে সুমন্ত্র আই.আই.টি বম্বে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিক্স-এ বি.টেক. এবং জ্যামিং নিয়ে ব্র্যান্ডাইস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. করেছে। সুমন্ত্র 'বিজ্ঞান' (bigyan.org.in)-এর একজন সম্পাদক।

লেখা দিতে হলে

বৈদ্যুতিন লোকবিজ্ঞান (Popular Science) পত্রিকা বিজ্ঞান (http://bigyan.org.in)-এর বিভিন্ন বিভাগগুলিতে বিষয়ভিত্তিক লেখার জন্য আমরা সকলকেই আমন্ত্রণ জানাই।

বিজ্ঞান-এ লেখা পাঠানোর আগে লেখক অবশ্যই রচনার নিয়মাবলীটি পড়ে দেখুন।

আমরা যে ধরণের লেখা পেতে আগ্রহী

- ❑ বিজ্ঞানের (ব্যাপক অর্থে – গণিত ইত্যাদি সহ) কোন ধারণা বা concept-এর সহজ এবং অভিনব ব্যাখ্যা। যা সহজে পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায় না অথবা অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে ভালভাবে বর্ণনা করা থাকে না। লেখকদের কাছে অনুরোধ আপনারা সাধারণ রচনাধর্মী লেখা পাঠাবেন না।
- ❑ কোন উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু ঘটনা, যা পড়ে তাঁর গবেষণা ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। উইকিপিডিয়ার রচনামূলক ধাঁচের বদলে, কোন বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদান এবং সেই আবিষ্কারের তাৎপর্যের উপর সংক্ষিপ্ত লেখাগুলো সাধারণত সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়।
- ❑ কোন গবেষণার বিষয়ের বর্ণনা যা পাঠককে সেই বিষয়ে আরো জানতে অনুপ্রাণিত করবে। এক্ষেত্রে খুব বেশী টেকনিক্যাল টার্ম না ব্যবহার করা বিধেয়।
- ❑ নিজে কর – সহজে বাড়িতে বা স্কুলে তৈরী করা যেতে পারে বা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এমন কোন বিষয়!
- ❑ বিজ্ঞানের কোন বিশেষ সমস্যা, যা বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে/ভাবিয়েছে তার বর্ণনা।
- ❑ বিজ্ঞানের খবর বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় যা বর্তমানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি। এইধরণের বিষয়ে নতুন কোন আবিষ্কার বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি কাম্য। কেবল মাত্র সমস্যার সাধারণ বর্ণনা যা উইকিপিডিয়ায় পাওয়া যাবে তা নয়।
- ❑ বিজ্ঞান বা অঙ্কের মজার ধাঁধা।

কিছু নিয়মকানুন

- ❑ লেখাটি বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। মেটাফিজিক্স জাতীয় লেখা পেতে আগ্রহী নই আমরা।
- ❑ রাজনৈতিক বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সমালোচনামূলক লেখা দয়া করে পাঠাবেন না।
- ❑ সম্পাদক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- ❑ লেখাতে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্যের উৎস উল্লেখ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়াও লেখার শেষে প্রাসঙ্গিক কিছু লেখা বা ভিডিও-র লিঙ্ক দিলে কৌতূহলী পাঠকের উপকারে আসবে।

লেখার খুঁটিনাটি

- ❑ প্রতিটি লেখা বাংলা হরফে (Unicode) Google doc ফাইল হিসেবে ই-মেল-এ জুড়ে পাঠাতে হবে। ছবির ক্ষেত্রে best possible resolution-এ পাঠাতে হবে।
- ❑ ই-মেল-এ বিষয় এবং কোন বিভাগের জন্য লেখা পাঠাচ্ছেন তা উল্লেখ করুন। সেই সাথে আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানান।
- ❑ ই-মেল করুন bigyan.org.in@gmail.com-এ।